UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

BENGALI **CODE:19**

Unit – 3 কাব্য কবিতা

সূচিপত্র

Sub Unit – 1:

3.1 ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত - তত্ত্ব, বড়দিন, স্নানযাত্রা, পাঁঠা, তপসে মাছ, আনারস, পিঠাপুলি

Sub Unit – 2:

3.2 মাইকেল মধুসূদন দত্ত - মেঘনাদবধ কাব্য

Sub Unit – 3:

3.3 বিহারীলাল চক্রবর্তী - সাধের আসন

Sub Unit – 4:

3.4 কামিনী রায় - প্রনয় বাধা, সেকি?, চন্দ্রপীড়ের জাগরণ, সুখ, দিন চলে যায়

Sub Unit – 5:

3.5 কাজী নজরুল ইসলাম - বিদ্রোহী, আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে, সর্বহারা, আমার কৈফিয়ৎ, পূজারিনী, সব্যসাচী

Sub Unit – 6:

3.6 জীবনানন্দ দাশ - বোধ, হায়চিল, সিন্ধুসারস, শিকার, গোধূলি সন্ধ্যার নৃত্য, রাত্রি

Sub Unit – 7:

3.7 বিষ্ণু দে - ঘোড়সওয়ার, প্রাকৃত কবিতা, জল দাও, ২৫শে বৈশাখ, দামিনী, স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত, গান

Sub Unit – 8:

3.8 সুধীন্দ্রনাথ দত্ত - জেসন, সংবর্ত, যযাতি

Sub Unit – 9:

3.9 অমিয় চক্রবর্তী - ঘর, চেতন স্যাকরা, বড়বাবুর কাছে নিবেদন, সংগতি, বিনিময়

Sub Unit – 10:

3.10 সমর সেন - মেঘদূত, মহুয়ার দেশ, একটি বেকার প্রেমিক, উর্বশী, মুক্তি

Sub Unit – 11:

3.11 সুভাষ মুখোপাধ্যায় - প্রস্তাব :১৯৪০, মিছিলের মুখ, ফুল ফুটুক না ফুটুক, যেতে যেতে, পাথরের ফুল, কাল মধুমাস

Sub Unit – 12:

3.12 শক্তি চট্টোপাধ্যায় - অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছে, আনন্দ ভৈরবী, অবনী বাড়ি আছো?, চাবি, হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান, যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো

Sub Unit – 13:

3.13 কবিতা সিংহ - রাজেশ্বরী নাগমণিকে নিবেদিত, প্রেম তুমি, আন্তিগোনে, গর্জন সত্তর, হরিনা বৈরী

teachinns
Text with Technology

Sub Unit- 1
ঈশ্বরগুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)

ঈশ্বরগুপ্ত একজন সাহিত্যিক, কবি, সাংবাদিক ১২১৮ বঙ্গাব্দে ২৫ ফাল্গুন (১লা মার্চ ১৮১২) পশ্চিম বঙ্গের জেলায় কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচরাপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের প্রেরণায় এবং বন্ধু যোগেন্দ্র মোহন ঠাকুরের আনুকূল্যে ১৮৩১ সালে ২৮শে জানুয়ারি তিনি সপ্তাহিক 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যুগসসন্ধির কবি হিসেবে পরিচিত। ঈশ্বরগুপ্তের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'পাষন্ডপীড়ণে'র প্রকাশ হয় ১৮৪৬ খ্রিঃ। বঙ্গভাষায় পদ্যে সর্বপ্রথম কার্টুন রচনা করে ঈশ্বরগুপ্ত।

❖ উল্লেখযোগ্য মন্তব্য ঃ

- ''ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতা দেখিয়া মনে হয় তিনি কবি ও পাঠকের মধ্যে কোন ব্যবধানসীল গড়িয়া তোলেন নাই; কবি পাঠকের সহিত একি ভূমিতে দাঁড়াইয়া পাঠককে তাঁহার কথা শুনাইয়াছেন।''
  [বঙ্কিমচন্দ্র : ঈশ্বরগুপ্তর কবিতা সংগ্রহ]
- ''ঈশ্বরগুপ্তের মনের ঝোঁক ছিল লোকসঙ্গীতের উপর বিশেষ করিয়া গ্রাম্য ছড়া ও লোক গীত ছন্দের উপর।''
  [তারাপদ মুখোপাধ্যায় : আধুনিক বাংলা কাব্য]
- ''যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিয়াছেন ; এমন খাঁটি বাঙ্গালায় এমন বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষায়, আর কেহ পদ্য কি গদ্য কিছুই লেখে নাই।'' [বঙ্কিমচন্দ্র ; ঈ.গু.জী.ক. ৩য় পরিচ্ছেদ কবিত্ব]
- ''ঈশ্বরগুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) যুগসন্ধিক্ষনের কবি ও ইহার রুচি নিয়ামক। তাঁহার কবিতার মধ্য ও আধুনিক যুগের সংমিশ্রন ধারাটি স্পষ্টভাবে লক্ষ্য গোচর হয়।'' [শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা]
- ''কবি ঈশ্বরগুপ্তকে আমরা 'ভোরের পাখী' বলতে পারি তিনি কাব্য কবিতার মাধ্যমে যে প্রভাত কলরব সৃষ্টি করেন, তাহারা সুর পুরাতন প্রবাহের শেষ তরঙ্গধ্বনি অথবা নবীন প্রাণবার্তার আদিম মন্দ্রগুঞ্জরণ ; তাহাই আমাদের বিচার করিতে হইবে।'' [অসিত কু. বন্দ্যোপাধ্যায় ; উনবিংশ শতাব্দির প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য ১৯৬৫]

➢ নির্বাচিত কবিতা ঃ

কবিতার নাম	কাব্যগ্রন্থের নাম	পত্রিকা প্রকাশ	প্রথম লাইন	শেষ লাইন
তত্ত্ব (ত্রিপদী ছন্দ)	ঈশ্বরগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা	×	কলেবর কুটীরেতে ইন্দ্রিয় তস্কর	পল ফেলে ধান্য লয়, কৃষক যেমন।।
বড়দানি	ঈশ্বরগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা	×	খ্রীষ্টের জন্মদিন, বড়দিন নাম।	করিবে করিয়া কৃপা হও, আশুতোষ।।
স্নানযাত্রা (ত্রিপদী ছন্দ)	ঈশ্বরগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা	×	শুনে বলি হরি যাই - সাধু সাধু সাধু তাই	ঘরে যেন মুক্তি স্থান পাই
পাঁটা	ঈশ্বরগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা	×	রসভরা রসময়; রসের ছাগল	সাতান্ন পুরুষ তার স্বর্গে যায় চলে।।
তপসে মাছ	ঈশ্বরগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা	১২৫৬ সালে ৩১ জৈষ্ঠসংবাদ প্রভাকর	কষিত কনককান্তি কমনীয় কায়	হায় রে তপস্যা তোর তপস্যার কি জোর।।
আনারস	ঈশ্বরগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা	১২৫৬, ২৮শে আষাঢ়, সংবাদ প্রভাকর	বন হতে এল এক টিয়ে মানোহর।	পালো এসে বাস করো মরণের কালে।।
পিঠা-পুলি	ঈশ্বরগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা	×	সুখের শিশির কাল, সুখে পূর্ণ ধরা	মাঝে মাঝে হাস্যরবে সুখের যৌতুক।।

তত্ত্ব

তত্ত্ব কবিতায় কবি কলেবর কুটিরে তস্কর ইন্দ্রিয়ে র কথা উল্লেখ করেছেন। সেখানে সমস্ত জীবরা অজ্ঞান হয়ে আছে সেখানে কেউ শিবের উপাসনা করে না, ভক্তি করে না। মান এবং হুঁষ অর্থাৎ জ্ঞান মানুষের অছে, যা পশুর থাকে না। জ্ঞান ছাড়া মানুষে ও পশুতে কোনো তফাৎ নেই। আবার হোম যজ্ঞ পূজার্চনা করে মানুষ ঠকিয়ে শিব সেবা হয় না, মানুষ নিজ সংসারের

ভালো কাজের মধ্যে সুখ খোঁজার চেষ্টা যেখানে জীব জ্ঞানে শিব সেবা সার্থক হয়। শুধু পুঁথি পড়ার কোনো অর্থ বা মর্ম না বোঝে। যেমনভাবে জ্ঞানীরা শাস্ত্র ছেড়ে জ্ঞানকে গ্রহণ করে, যেমন করে পল ফেলে কৃষকরা ধান নেয়। প্রেম ভক্তি সবকিছুর আধার হল ভগবানের ভক্তি। সেই ভক্তির দ্বারা প্রভুর চরনে মন সঁপে দিতে হবে যার মাধ্যমে মোক্ষ লাভ সম্ভব।

- ঈশ্বর গুপ্তের 'তত্ত্ব' কবিতার স্তবক সংখ্যা ১২টি।
- 'তত্ত্ব' কবিতায় মোট লাইন সংখ্যা - ৯৬
- 'তত্ত্ব' কবিতায় 'প্রতি স্তবকের লাইন সংখ্যা - ৮
- 'তত্ত্ব' কবিতায় মুক্তির একমাত্র কারন বলা হয়েছে মনকে।
- 'তত্ত্ব' কবিতায় বলা হয়েছে যে মানুষ যদি রিপুজয়ী না হয় এবং জ্ঞান অর্জন করতে না পারে তবে পশুর সাথে তার কোনো তফাৎ নেই।

❖ উল্লেখযোগ্য পংক্তি ঃ

- কলেবর কুটিরেতে ইন্দ্রিয় তস্কর।
  ধরিয়া প্রবল বল, আছে নিরন্তর।।
- নিজ ঘরে চুরি তার শাসন না হয়।
  হরিতে পরের ধন ব্যাকুল হৃদয়।।
- নর যদি রিপুজয়ী, জ্ঞানেতে না হবে।
  পশুর সহিত তার, প্রভেদ কি তবে।।
- আপনারে বড়ে বলে; মরে অভিমানে।
  অথচ সে আপনারে; কভু নাহি জানে।।
- ডাক ছেড়ে মন্ত্র পড়ে, হোম করে কত।
  নানারূপ বেশ ধরে, দাম্ভিকের মত।।
- সবই আসক্ত মন, সংসারের সুখে।
  শোক আর তাপ পেয়ে, দগ্ধ হয় দুখে।।
- বৃথা পরিশ্রম করে, হরে আয়ুধন।
  অবোধের পাঠ আর, অন্ধের দর্পণ।।
- দেখিব প্রত্যক্ষ যাহা, মেনে লবে তাই।
  বচন গ্রহনে কোন, প্রয়োজন নাই।।
- অমৃত ভোজন করি তৃপ্তিলাভ যার।
  আহারের প্রয়োজন, কিছু নাহি তার।।
- শাস্ত্র ছেড়ে জ্ঞানী করে, জ্ঞানের গ্রহণ।
  পল ফেলে ধান্য লয়, কৃষক যেমন।।

বড়দিন

কবি ঈশ্বরগুপ্ত যিশুখ্রিস্টকে খ্রিষ্টানেরা বড়দিন হিসাবে পালন করলেও খ্রিষ্টানদের বেলেল্লাপনার মূল উৎসবের পবিত্রতা ক্ষুন্ন হয়েছে। কোলকাতা শহরের কেরাণী ; দেওয়ানেরা সাহেবদের বাড়িতে বড়দিন উপলক্ষে ভেটকি মাছ; কমলালেবু ; মিছরি ; বাদাম ইত্যাদি বস্তু উপহার পাঠান। ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মানুষরা এই বড়দিন উপলক্ষে আনন্দে যেতে ওঠে। মেরি মাতার কোলে যেমন শিশু যিশু শোভা পায় তেমনি যশোদার কোলে গোপাল শোভা পায়। স্বপ্নাদেশে কুমারী মেরি মাতার কোলে যিশু খ্রিষ্টের জন্ম হয় বলে, তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলা হয়। বড়দিন উপলক্ষে শহরের রাস্তায় আন্দুস, পিন্দুস, ডিঞ্জস, মেন্ডস্, ডিকোষ্টা তিরোজা , জোনা, ডিসোজা গথিস জেসু নেসু কেশু প্রভৃতি বিদেশি ভিড় জমায়। কবিতায় জাহ্নবী নদী ও টপ্পা গানের উল্লেখ আছে। কবিতার শেষে কবি পরিহাস ছলে বলেছেন কেউ যেন এ কবিতার দোষ না ধরেন। আর সেজন্য তিনি আশুতোষের কাছে কৃপাপ্রার্থী।

- 'বড়দিন' কবিতাটি মোট লাইন সংখ্যা - ১৬৬
- ঈশ্বরগুপ্তের উৎসব বিষয়ক কবিতা হল - বড়দিন
- খ্রিষ্টানদের বেলেল্লাপনায় মূল উৎসবের পবিত্রতা ক্ষুন্ন হয়েছে।
- খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ - বাইবেল। এর দুই ভাগ ওল্ড টেস্টামেন্ট ; নিউ টেস্টামেন্ট।

❖ **উল্লেখযোগ্য পংক্তি ঃ**

- ‘খ্রীষ্টের জন্মদিন, বড়দিন নাম।
  বহু সুখে পরিপূর্ণ, কলিকাতা ধাম।।’
- ‘‘কেথলিক দল সব প্রেমানন্দে দোলে।
  শিশু ঈশ্বর গড়ে দেয় ; মেরি মার কোলে।’’
- ‘‘শিষ্যগণ সঙ্গে সদা ; যুগি জোলা জেলে।
  সবে বলে এই প্রভু ঈশ্বরের ছেলে।’’
- ‘‘পাপী পরিত্রাণ হেতু করুণানিধান।
  জুশের ক্রুশের ঘায়ে তাজিলেন প্রাণ।।’’
- ‘‘ওল্ড এক টেষ্টমেন্ট, গোল্ড তার বাঁধা।
  কোল্ড করে মানুষের লাগাইয়া ধাঁধা।।’’
- ‘‘শক্তি সহ ভক্তিভাবে, খেয়ে মাংস মদ।
  হাতে হাতে স্বর্গলাভ, প্রাপ্ত ব্রহ্মপদ।।’’
- ‘‘কোনোরূপে পিত্তি রক্ষা ; এঁটো কাঁটা খেয়ে।
  শুদ্ধ হন ধেনো গাড়ে ; বেনোজলে নেয়ে।।’’
- ‘‘সাহেবের হুড়াহুড়ি ; জাহ্নবীর জলে।
  করিতেছে ‘রোটরেস’- সেলের সকলে।।’’
- অতএব কেহ চার ধরিবে না দোষ
  করিবে করিয়া কৃপা, হও আশুতোষ।।’’

স্নানযাত্রা

‘স্নানযাত্রা’ ঈশ্বরগুপ্তের সমাজ চেতনা বিষয়ক কবিতা। বৃষ পূর্ণিমার দিন মাহেশের মহামেলায় স্নানযাত্রায় দলে দলে জনসমাগম হয় মাহেশে মহামেলার দিন পুন্যার্থীরা পৈতৃক তসর ছেড়ে বিলাতি জুতো ও ধোপা ধুতি পরিছেন। চাঁপাতলা শূন্য করে নরহরির দল ঘাটের দিকে এগিয়ে যায়। হাড়ি, মুচি, যুগী, জেলা ও চোখের পোলা (মুসলিমরা) দলে দলে স্নানের উদ্দেশ্যে যায়।

মাহেশে যারা স্নান করতে যান তারা সকলেই শাক্ত কিন্ত কেউ উপযুক্ত ভক্ত নয়। মাহেশে বৃষ পূর্ণিমার দিন বাবু হয় ধোপারা। মাহেশের স্নানযাত্রার বিষয়টিকে তিনি কবিতায় বর্ণনা করেছেন।

- ‘স্নানযাত্রা’ কবিতায় কাক ও ফিঙের নাম রয়েছে।
- ‘স্নানযাত্রা’ কবিতায় আম, কাঠাল এর উল্লেখ আছে।
- কবিতায় হাতির নাম উল্লেখ আছে এবং এর লিচু, মোন্ডা প্রভৃতি খাবারের নাম রয়েছে।

❖ **উল্লেখযোগ্য পংক্তি ঃ**

- ফুলায় বুকের ছাতি যেন নবাবের নাতি
  হাতী কিনে হয়ে বসে ভূপ।।
- পূর্ণ হল ইচ্ছা যেটা স্থান আর দেখে কেটা
  স্নান পান এক ঠাঁই বসে।।
- বসিল না হয় তায় অখিল ভরিয়া খায়
  মনে মনে সাধ আছে খুব।।

পাঁটা

ঈশ্বরগুপ্ত একবার জলপথে ভ্রমণে বেরিয়ে আহার সন্ধানে প্রচুর কষ্ট পাবার পর অবশেষে একটি পাঁটা সংগ্রহ করে তৃপ্তির সঙ্গে ভোজন করেছিলেন। তৃপ্তির সহিত ভোজন পূর্বক এই কবিতাটি তিনি রচনা করেন ‘পাঁটা’। পাঁটার মহিমাকীর্তন করেছেন অর্থাৎ এটি খাদ্যবস্তু বিষয়ক কবিতা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছাগলের গুন দেখে অভিমান করে বরাহরূপ ধারণ করেন। যবন-হিন্দু বরাহকে আপমান করলেও ইংরেজরা তার মান রেখেছে। হোটেলে বরাহ মাংস হ্যাম্ নামে বিক্রি হয়। প্রতিদিন প্রাতে উঠে ‘পাঁটা’ বলতে বলতে স্বর্গে চলে যাবে।

- ‘পাঁটা’ কবিতার মোট লাইন সংখ্যা - ১২৪

- ‘পাঁটা’ কবিতাটি ভিন্ন পাঠ হল -পাঁঠা
- পাঁটার মহিমাকীর্তন ঈশ্বরগুপ্তের পরবর্তীকালে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের রচনাতেও পাওয়া যায়। কবিতাটি অবশ্য রবীন্দ্রনাথের উর্বশী কবিতার প্যারোডি সর্ব্বশী নামে পরিচিত।
- ড. রেণুপদ ঘোষের মতে কাশীরাম দাশের মহাভারতের অনুসরনেই ঈশ্বরগুপ্ত পাঁটার মহিমাকীর্তন করেছেন।
- ‘‘তিনি ‘পাঁটা’ কবিতা সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে পাঁটার সাদা ও কালা ছানাগুলিকে কানাই বলাইয়ের সাথে তুলনা করিয়াছিলেন। কানাই বলাই যেমন গোষ্ঠে খেলা করিয়াছিলেন, ইহারাও সেই রূপ খেলা করে।’’ [রাজনারায়ন বসু ; বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা]

তপসে মাছ

তপসে মাছের গুণগানের বর্ণনা করতে গিয়ে ঈশ্বরগুপ্ত কখনো কখনো একে ‘সকলের গুরু’ এবং ‘খড়দার প্রভু’ নিত্যানন্দের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কুড়ি টাকা দরে তাজা তাজা তপসে মাছ কেনার কথা আছে। তপসে মাছ নোনা জলে বাস করে। সাহেবরা তপসে মাছকে ম্যাঙ্গোফিস বলে। সমুদ্রমন্থন কালে দেবাসুরের যুদ্ধে যে অমৃত উঠেছিল, সেই অমৃত ভক্ষণ করে তপসে মাছের সুরমধু আস্বাদন হয়েছে । উলুবেড়িয়ার গাঙে সাগরের নোনা জলে তপসে মাছ বিহার করলে ও নগরের উত্তরের দিকে তার যাতায়াত নেই। তপসে মাছ যদি দাড়ি গোঁফ নেড়ে উজানের পথে আসে তাহলে ছেলে মেয়েরা শাঁখ ঘন্টা বাজাবে। কবি বলেছেন যদি মিঠে জলে তপসে মাছ আসে তাহলে কবি ভিটে মাটি বেচে পুজো দেবেন। কবি তপসে মাছে ডিম, তপসে মাছের ভাজা, ঝোল ও ঝাল খেতে চান ।

- ‘তপসে মাছ’ কবিতাটি ১২৫৬ সালে ৩১শে জৈষ্ঠ ‘সংবাদ প্রভাকর’ এ প্রকাশিত হয়।
- তপসে মাছ কবিতাটি সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হলে কবিতাটির শেষে রচয়িতা নামের পরিবর্তে মুদ্রিত ছিল - ‘তাহং পেটুক’ এবং সব শেষে মুদ্রিত ছিল ‘চাই এন্ডাওয়ালা তপসে মাছ’।
- তপসে মাছ কি মাছের মতো ১০\১২ আঙ্গুল চ্যাপ্টা দেহ ; সোনা রঙের যে মাছ সমুদ্র থেকে গঙ্গায় আছে সেই মাছ দেখে রঙ্গ-কৌতুক প্রিয় কবির তপস্বীর কথা মনে পড়ে যায়।
- ‘তপসে মাছ’ কবিতায় মোট লাইন সংখ্যা - ১০৮ টি

❖ উল্লেখযোগ্য পংক্তি ঃ

- কষিত কনককান্তি কমনীয় কায়।
  গালভরা গোঁফ-দাঁড়ি-তপস্বীর প্রায়।।
- পাখী নও ধর মনোহর পাখা।
  সুমধুর মিষ্ট রস সব অঙ্গ মাখা।।
- অমৃত ভক্ষন তাই এরূপ প্রকার।
  সুমধুর আস্বাদন হয়েছে তোমায়।।
- জন্ম-ত্রয়ো হও তুমি রসমতী সতী।
  পোয়াতীর গর্ভে থেকে হও গর্ভবতী।।

আনারস

‘আনারস’ কবিতাটি সমসাময়িক প্রাকৃতিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত। আষাঢ় মাসেই বাজারে প্রচুর আনারস পাওয়া যায়। তাই আষাঢ় মাসেই ঈশ্বরগুপ্ত আনারস কবিতা রচনা করেন। নন্দনবনে দেবরাজ ইন্দ্র শচীকে ছেড়ে আনারস আলিঙ্গন করার পর থেকে আনারসের গায়ে সহস্র লোচনের জন্ম হয়। আনারস তুলনামূলকভাবে সস্তা, তাই আনারস সবাই খেতে পারলেও বেদানা সবাই খেতে পারে না। বেদানার যশ থাকলেও তা কেবলমাত্র ধনী লোকেরা উপভোগ করতে পারে। কবি উল্লেখ করেছেন আনরসের স্বাদ ব্যাক্তিভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। যুবকের কাছে যুবতীর অধরামৃত। বৃদ্ধের কাছে হরিনাম সুধা, বালকের কাছে জননীর স্তন।

- ‘আনারস’ কবিতাটির প্রকাশ কাল -১২৫৬, ২৮ আষাঢ় (১৮৪৯সালে ১১ই জুলাই) প্রথম সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হয়।
- ‘আনারস’ কবিতায় ১১৬ টি লাইন রয়েছে।
- সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত এই কবিতাটির শেষে কবি রঙ্গ করে নিজের নামের পরিবর্তে বড়ো বড়ো অক্ষরে লিখেছেন -‘একখানি আনারস’।

- ‘আনারস’ সম্পর্কে লোকসমাজে প্রচলিত ধাঁধা -
  ‘‘বন হোতে এল এক টিয়ে মনোহর।
  সোনার টোপোর শোভে, মাথায় ভিতর।।’’
  [ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোক সাহিত্য]

❖ উল্লেখযোগ্য পংক্তি ঃ

- রূপের সহিত গুণ সমতুল হয়।
  সুবাসে আমোদ করে ত্রিভুবনময়।।
- ঈষৎ শ্যামল রূপ চক্ষু গায়।
  নীলকান্ত মণিহার চাঁদের গলায়।।
- তিন লোক জয় করে তব আস্বাদন।
  বালকের কাছে তুমি জননীর স্তন।।
- যুবতী অধরামৃত যুবকের কাছে।
- হরিনাম সুধা তুমি বৃদ্ধের কাছে।
- ত্রিজগতে তব গুণে বাধ্য আছে সব।
  বিন্দুরস পান করি প্রাণ যায় সব।।
- রস পেয়ে জানা গেল স্বর্গ থেকে আনা।
  নানা-রস শ্রেষ্ঠ তুমি তোমার প্রণাম।।

পিঠা-পুলি

কবি ঈশ্বরগুপ্তের পৌষ পার্বণের দিনে হিন্দু সংসারের একটি চিত্র তুলেছেন, দৈনন্দিন জীবনে নারীদের ব্যস্ততা তার মধ্যে পৌষ পার্বনের পিঠা পুলির বন্দোবস্ত করা স্বামীর প্রতি কর্তব্য, ছেলেপিলেদের প্রতি কর্তব্য সংসার কলহ প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কবি তুলে ধরেছেন। বিশেষত নারীদের জীবন প্রনালী নারীদের সংসারের প্রতি দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতাকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

- পিঠা-পুলি কবিতাটির মোট লাইনের সংখ্যা ১৫২।
- কবিতায় তুক তাক মন্ত্রতন্ত্র এর কথা উল্লেখ রয়েছে।
- কবিতায় গঙ্গাজলের উল্লেখ রয়েছে।

❖ উল্লেখযোগ্য পংক্তি ঃ

- সুখের শিশির কাল, সুখে পূর্ণ ধরা।
  এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভর।।
- কি বলিব বাপ মায়, কেন দিলে বিয়ে।
  এক দিন সুখ নাই, ঘরকন্না নিয়ে।।
- আলু তিল গুড় ক্ষীর নারিকেল আর।
  গড়িতেছে পিটেপুলির অশেষ প্রকার।।
- তরুনী রমণী যত, একত্র হইয়া।
  তামাসা করিছে সুখে, জামাই লইয়া।।
  আহারের দ্রব্য লয়ে কৌশল কৌতুক।
  মাজে মাজে হাস্যরবে, সুখের যৌতুক।।

Sub Unit - 2
মধুসূদন দত্ত (১৮২৮-১৮৭৩)

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮২৪ খ্রিঃ ২৫শে জানুয়ারি বর্তমান বাংলাদেশের যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রাজনারায়ণ দত্ত পেশায় ছিলেন সম্ভ্রান্ত আইনজীবী। মাতা জাহ্নবী দেবীর তত্ত্বাবধানে তাঁর লেখাপড়া। ১৮৪৩ খ্রিঃ বিলেতে গিয়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহন করে তিনি 'মাইকেল' নামধারী হন। ছাত্রজীবনে দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় Captive Lady এবং Vision of the Past। ইংরেজী সনেট-এর অনুসরণে বাংলায় 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচনার প্রথম কৃতিত্ব ও তাঁর চতুর্দশপদী কবিতাবলী তাঁর প্রতিভার অনন্য কৃতিত্ব। ১৮৭৩ খ্রিঃ ২৯শে জুন মহাকবির প্রয়াণ ঘটে।

❖ তথ্য ঃ

- 'মেঘনাদবধ কাব্য' ১৮৬১ (প্রথম খন্ডের (১ম - ৫ম সর্গ) প্রকাশকাল ৪ই জানুয়ারি, ১৮৬১ খ্রিঃ শুক্রবার, দ্বিতীয় খন্ডের প্রকাশকাল ১৮৬১ খ্রিঃ মাঝামাঝি, কাব্যটি রচনাকাল প্রায় ১ বছর)
- মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় খন্ডের আখ্যানপত্রে কালিদাসের 'রঘুবংশম' থেকে একটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্বৃত করা হয়েছে সেটি হল - ''কৃতবাগ্দ্বারে বংশেহস্মিন্ পূর্বসূরিভিঃ।
  মনৌবজ্রসমূৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ।।''
  ['রঘুবংশম' প্রথম সর্গ, ৪র্থ শ্লোক]
- মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্গের রচনাকালের মাঝখানে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক রচনা করেন।
- মেঘনাদবধ কাব্য একটি সাহিত্যিক মহাকাব্য।
- মেঘনাদবধ কাব্যের ১ম খন্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ পায় ২১শে আগস্ট, ১৮৬৭ খ্রিঃ।
- মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণ দুই খন্ডে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ১ম খন্ড ১২৬৯ ও দ্বিতীয় খন্ড - ১২৭০ সালে প্রকাশ পায়।

❖ উল্লেখযোগ্য মন্তব্য ঃ

- ''চিনাবাজারের সামান্য শিক্ষিত সুদিও মেঘনাদবধ পড়ে আনন্দ পেয়েছিলেন।''
  [নগেন্দ্রনাথ সোম ; মধুস্মৃতি]
- ''কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙিয়াছেন এবং রাম-রাবণের সম্বন্ধে অনেক দিন হইতে আমাদের মনে যে একটা বাঁধাবাঁধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে স্পর্ধাপূর্বক তাহার ও শাসন ভাঙিয়াছে। এই কাব্যে রাম-লক্ষণের চেয়ে রাবণ ইন্দ্রজিৎ বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। .....বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।''
  [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]
- Michael began with an epic but in a lyric ; Or it may be said of him what point. Saintsbury says of Milton, that he was the greatest in the lyric in his epic.
  [হরেন্দ্রমোহন দাসগুপ্ত]
- 'মধুসূদন কিন্তু এ কাব্যকে মহাকাব্য বলেননি, তিনি বলেছিলেন 'epicling' অর্থাৎ ছোটো মাপের মহাকাব্য'-
  [নগেন্দ্রনাথ সোম ; মধুস্মৃতি]

প্রথম সর্গ (অভিষেক)

প্রথম সর্গের প্রারম্ভে কবি 'বীণাপাণি' ও 'কল্পনা' দেবীর বন্দনা সংগীত উচ্চারন করেছেন। রাম সৈন্যের সঙ্গে সৈন্যের যুদ্ধের পশ্চাৎপটে লঙ্কাধিপতি রাবণের রাজসভার দৃশ্য সেখানে উন্মোচিত। ভগ্নদূত মকরাক্ষ চিত্রাঙ্গদার পুত্র বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ রাবণকে দেয়। রাবণ মেঘনাদকে যুদ্ধের জন্য সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করেন।

- বীরবাহুর মায়ের নাম চিত্রঙ্গদা, তিনি গান্ধর্ব্ব কন্যা।
- বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ যে ভগ্নদূত রাবণকে দিয়েছিল তার নাম মকরাক্ষ।
- জলদেবতা বরুনের স্ত্রী হল বারুণী। বারুণীর সখী হল মুরলা।
- বারুণীর নির্দেশে সখী মুরলা 'রমা'; ইন্দিরা; রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন যুদ্ধের বার্তা শোনার জন্য।

- মেঘনাদের প্রমোদ কাননে রমা মেঘনাদধাত্রী প্রভাষার ছদ্মবেশে প্রবেশ করে মেঘনাদকে বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ দান করেন।
- রাবণ প্রিয় পুত্র ইন্দ্রজিৎকে নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ করে যুদ্ধযাত্রার নির্দেশ দেন।
- রমা প্রভাষার ছদ্মবেশে মেঘনাদকে বীরবাহুর সংবাদ দেন।

❖ উল্লেখযোগ্য পংক্তি ঃ

- ‘সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর - চূড়ামনি
  বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে....।’
- ‘থানা দিয়া পূর্ব্ব দ্বারে, দুর্ব্বার সংগ্রামে,
  বসিয়াছে বীর নীল; দক্ষিন দুয়ারে,
  অঙ্গদ, করভসম নব বলে বলী ;
- ‘কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
  প্রচেত ! হা ধিক ওহে ছলদলপতি!’
- ‘যথায় কমলালয়ে , কমল-আসনে
  বসনে কমলময়ী কেশব - বাসনা.....।’
- ‘প্রমদা-কুল-রোদন! প্রতি গৃহে কাঁদে
  পুত্রহীনা মাতা, দূতি ; পতিহীনা সতী !’
- ‘ইন্দ্রজিতে জিতি তুমি, সতি
  বেঁধেছ যে দৃঢ় বাঁধে কে পারে খুলিতে’
- ‘‘রাক্ষস - কুল - শেখর তুমি , বৎস ; তুমি
  রাক্ষস - কুল ভরসা।’’
- ‘‘.....বিধি বাম মম প্রতি।.....
  কে কবে শুনেছে .....লোক মরি পুনঃ বাঁচে?’’
- ‘‘.....গিরিশৃঙ্গ কিম্বা তরু যথা
  বজ্রাঘাতে ! তবে যদি একান্ত সমরে
  ঈচ্ছা তব, বৎস আগে পূজা ইষ্টদেবে.....।’’

teachinns Text with Technology

দ্বিতীয় সর্গ (অস্ত্রলাভ)

এই সর্গে দেখতে পাই, সর্গের দেবদেবীগণ রামচন্দ্রকে প্রতক্ষ্যভাবে লঙ্কাসমরে সহায়তা করছেন। রক্ষোরাজ রাবণ যেদিন বীরকেশরী মেঘনাদকে সৈনাপত্যে বরণ করলেন সেদিন রাত্রিতেই রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ কে নিপাতিত করবার জন্য স্বর্গলোকে চলছিল দেবদলের ষড়যন্ত্র। ভক্তদ্রোহিনী রক্ষঃকুল রাজলক্ষ্মীর প্ররোচনায় দেবরাজ ইন্দ্র ও তৎপত্নী শচীদেবী কৈলাসে মহাদেব-পার্বতীর সন্নিধানে গেছেন ; দেবকুলপ্রিয় রামচন্দ্রকে আসন্ন সংকট থেকে রক্ষা করার জন্য পার্বতী মোহিনী মূর্তী ধারন করে মীনকেতন-সমভিব্যাহারে যোগসনশৃঙ্গে গিয়ে মহাদেবের তপোভঙ্গ করেছেন ; পার্বতী মোহিনীরূপে আবিষ্ট হয়ে মহাদেব ইন্দ্রজিতের পত্নীকে জানিয়ে দিয়েছেন। তারপর লক্ষ্মন শক্তীশ্বরী মায়াদেবী ও বিভীষনের সহায়তায় নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মেঘনাদকে দেবী অস্ত্রনিক্ষেপে ভাস্করের মতো হত্যা করেছেন।

- দেবসভায় নৃত্য পররিবেশন করে উর্বসী রম্ভা, চিত্রলেখা, ও মিশ্রকেশী এই চারজন অপ্সরা
- দেবসভায় ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীতে সঙ্গিত পরিবেশিত হয়েছিল।

❖ উল্লেখযোগ্য পংক্তি ঃ

- ছয় রাগ মূর্ত্তিমতী / ছত্রিশ রাগিনী সহ ; আসি আরম্ভিলা / সঙ্গীত।
- একমাত্র বীর সেই আছে লঙ্কাধামে
  এবে ; আর বীর যত, পুত্র এ সমরে।
- দেবেন্দ্রে : গন্ধর্ব্বকুল আমার অধীনে
  আইনু এ পুরে আমি ইন্দ্রের আদেশে।

তৃতীয় সর্গ (সমাগম)

এই সর্গের প্রধান ঘটনা প্রমোদ উদ্যান থেকে ইন্দ্রজিৎ প্রিয়া প্রমীলার লঙ্কাপুরীতে আগমন। প্রমীলা চরিত্রটি মধুসূদনের নতুন সৃষ্টি। রামায়নে এর অস্তিত্ব নেই। প্রমীলার সখী বাসন্তী। বীরাঙ্গনা প্রমীলার একশত চেড়ী বা সখী ছিল তাদের মধ্যে অন্যতম নৃমুন্ডমালিনী।

- প্রমীলা রামচন্দ্রকে ভয় পায় না।
- রামচন্দ্র জানান রাবণ ছাড়া রাক্ষস-কুলবধূদের সাথে তাঁর শত্রুতা নেই।
- প্রমীলা দানবী, দৈত্য কালমেনির কন্যা।
- মহাশক্তি অংশে প্রমীলার জন্ম।

❖ উল্লেখযোগ্য পংক্তি ঃ

- '. . . .রক্ষঃ-কুল বধূ;
  রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,-
  আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?
  পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজ-বলে;'
- 'লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে
  কালি, কহিলেন চিত্ররথ সুর-রথী।'
- 'মনিহারা ফণী যেন পাইল সে ধনে!
  অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ কহিল কৌতুকে;-'
- দক্ষিণ দুয়ারে ফিরে কুমার অঙ্গদ
  ক্ষুধাতুর হরি যথা আহার-সন্ধানে;'
- 'উজলিল সুখ-ধাম রজোময় তেজে।
  ইতি শ্রীমেঘনাদবধ কাব্যে সমাগমো. . .।'

চতুর্থ সর্গ (অশোকবন)

এই সর্গের প্রথমে বাল্মীকিকে বন্দনা করেছেন। তারপর তিনি শ্রীভর্তৃহরি, ভবভূতি এবং মহাকবি কালিদাসকে স্মরণ করে তাঁদের মতো খ্যাত হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছেন। বন্দিনী সীতার সঙ্গে বিভীষন পত্নী সরমার কথোপকথন বর্পিত হয়েছে। মারীচ মায়ামৃগ রূপে সীতাকে প্রলুব্ধ করলে, রামচন্দ্র সীতার মনোবাসনা পূরণ করবার জন্য তাকে ধরতে পিছু ধাওয়া করেন। কিন্তু ধরতে ব্যর্থ হয়ে কঠিন শরে তাকে বিদ্ধ করেন। মরনকালে মারীচ রামের স্বর নকল করে আর্তনাদ করে। তাতেই সীতার অনুরোধ ও গঞ্জনায় লক্ষন রামের সাহায্যার্থে বনে গমন করেন সেই অবকাশে জটাজুট যোগীর ছদ্মবেশে রাবণ সীতাকে হরন করে।

- সীতা স্বপনে রাবণানুজ কুম্ভকর্ণের মৃত্যু দর্শন করেছিলেন
- বিভীষণের স্ত্রী সরমা গন্ধর্বরাজ শৈলুসের কন্যা।
- মূলত এই সর্গে বন্দিনী সীতা ও বিভীষণ পত্নী সরমার কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে।

❖ উল্লেখযোগ্য পংক্তি ঃ

- 'কীর্ত্তিবাস ; কীর্তিবাস কবি / এ বঙ্গের অলঙ্কার!'
- ''বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি বিধুমুখি!
  আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে. . .।''
- ''পঞ্চবটী বনে মোরা গোদাবরী-তটে
  ছিনু সুখে। হায়, সখি, বেম্মনে বর্ণিব. . . .।''
- ''রাজার নন্দিনী আমি, রাজ-কুল-বধু
  তবু বদ্ধ কারাগারে! কাঁদিনা রূপসী ;''

পঞ্চম সর্গ (উদ্যোগ)

কবি লক্ষ্মণকে নানারূপে বিভিষিকা ও প্রলোভনের সম্মুখীন করেছেন। ইন্দ্রজিৎ হত্যার বিধান বা কৌশল মায়াদেবী লক্ষ্মণকে বলে দেন। মায়াদেবীর নির্দেশে স্বপ্নাদেবী জননী সুমিত্রার বেশে লক্ষণকে স্বপ্নাদেশ দেন লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনের মধ্যে যে সরোবর আছে সেখানে একাকী গমন করে, সেই সরোবরে স্নান করে সরোবরের কুলে অবস্থিত চন্ডীর মন্দিরে নানাবিধ ফুলে দেবী চন্ডীর পুজা কর। তাঁর প্রসাদেই লক্ষণ মেঘনাদকে বধ করতে সক্ষম হবে।

- দেবগণ কর্তৃক মেঘনাদ বধের উদ্যোগ এই পঞ্চম সর্গের মূল বিষয়।
- লক্ষণের যে বিভীষিকার সম্মুখীন হয়েছিল সেগুলি হল -
  ক) প্রথম - বিরূপাক্ষ মহাদেব-ধর্মে সাক্ষী মেনে লক্ষ্মন তাঁকে যুদ্ধে আহ্বান করেন ; নতুবা পথ ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেন। চন্ডী লক্ষ্মণের প্রতি প্রসন্ন হওয়ায় মহাদেব তার পথ ছেড়ে দেন।
  খ) দ্বিতীয় - মায়া সিংহ -মায়া সিংহ লক্ষ্মণের পথ রোধ করলে লক্ষ্মণ জয় রাম বলে অসি নিষ্কষন করায় ভীত হয়ে মায়া সিংহ পথ ছেড়ে দেয়।
  গ) তৃতীয় - তুমুল ঝড়-বজ্র বিদ্যুৎসহ প্রবল মায়া ঝড়।
  ঘ) চতুর্থ - দাবানল - মায়া দাবানলে চারিদিকে অগ্নিময় নরক সৃষ্টি হল।
  ঙ) পঞ্চম - সুরসুন্দরী-সম্ভোগ সুখের জন্য লক্ষণকে আমন্ত্রণ জানালে লক্ষ্মণ তাদের মাতৃসমা বলে সীতা উদ্ধারের প্রার্থণা করে।
- লক্ষণ নীলোৎপল দিয়ে দেবী চন্ডীর পূজা করে।
- মহামায়াদেবী লক্ষণকে নিকুম্ভিলা যজ্ঞগারে প্রবেশের আদেশ দেন।
- প্রমীলা ও ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা যজ্ঞগারে যাওয়ার আগে জননী মন্দোদরীর আর্শীবাদ নিতে মাতৃসদনে গমন করেন।

❖ উল্লেখযোগ্য পংক্তি ঃ

- ‘রতন-সম্ভবা বিভা দ্বিগুণ বাড়িল
  দেবালয়ে ; বাড়ে যথা রবিকর জলে. . .।’
- ‘লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে!’
- ‘. . . .উঠ,বৎস পোহাইল রাতি।
  লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজী মাঝে. . .।’
- ‘‘শুভ ক্ষণে গর্ভে তোরে লক্ষ্মন, ধরিল
  সুমিত্রা জননী তোর !’’ কহিল আকাশে
  আকাশে-সম্ভবা বাণী. . . ।’’
- ‘‘কহিলা বীর কুঞ্জর; পূর্ব্ব-কথা স্মরি,
  এ বৃথা বিলাপ; মাতঃ, কর অকারণে !
  নগর তোরণে অরি ; কি সুখ ভুঞ্জিব. . . .।’’

ষষ্ঠ সর্গ (বধ)

রামচন্দ্র সর্প ও ময়ূরের মায়াযুদ্ধ চাক্ষুষ করেছেন। মায়াদেবীর অনুগ্রহে বিভীষণসহ লক্ষ্মণের তস্করের মতো অদৃশ্যভাবে নিকুম্ভিলা যজ্ঞগারে মেঘনাদ বধের ঘটনা এই সর্গের মূল বিষয়। ইন্দ্রজিৎ হত্যার পূর্বে যে ঘটনাগুলি ঘটেছিল সেগুলি হল রাবণের স্বর্ণমুকুট মাথা থেকে খসে পড়ে; স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে জীব সকল প্রমাদ গুণছিল। ভীত লঙ্কেশ্বর মহাদেবকে স্মরন করে না। প্রমীলার বাম চক্ষু নেচে উঠে, আত্মবিস্মৃতিতে প্রমীলা তার সিঁথির সিন্দুর মুছে ফেলে, এবং রানী মন্দোদরী মূচ্ছা যায়।

- নিকুম্ভিলা যজ্ঞগারে ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণকে লক্ষ্মণের বেশ-ধারী বৈশ্বানর বলে মনে করেছিল।
- মেঘনাদ বিভীষণকে ভর্ৎসনা করে।
- লঙ্কার পঙ্কজরবি আস্তাচলে যায় এই দৃশ্যে।

❖ **উল্লেখযোগ্য পংক্তি ঃ**

- ‘‘. .হায় রে কেমনে - / যে কৃতান্তদূতে দূরে হেরি উর্ধ্বশ্বাসে
  ভয়াকুল জীবকুল ধায় বায়ু বেগে
  প্রাণ লয়ে; দেব নয় ভস্ম যার বিষে ; -’’
- ‘‘নাহি দোষী আমি, বৎস; বৃথা ভৎস মোরে
  তুমি ! নিজ কর্ম দোষে , হায় ; মজাইলা
  এ কনক-লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি !’’

সপ্তম সর্গ (শক্তি নির্ভেদ)

রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে শক্তিশেলাঘাতে বিগতচেতন লক্ষ্মণের পতন এই সর্গের বর্নিত বিষয়। রাবন লক্ষ্মণের দেহ ধরতে গেলে বীরভদ্র তাঁকে শিবের নির্দেশ জানিয়ে নিবৃত্ত করলেন লঙ্কাপতি নিজ পুরীতে প্রত্যাবর্তন করলেন।

- রাবণের চতুরঙ্গ সেনানীর প্রধান চামর। চতুরঙ্গ হল - রথীরাহিনী, হস্তীবাহিনী, অশ্ববাহিনী, পদাতিক।
- রথীবাহিনীর প্রধান উদগ্র। গজবাহিনীর প্রধান বাস্কল। অশ্ববাহিনীর প্রধান অসিলোমা এবং পদাতিক বাহিনীর প্রধান হল বিড়ালাক্ষ।
- রাবণের যুদ্ধযাত্রায় যে সমস্ত রণবাদ্য বেজে উঠেছিল, সেগুলি হল - ভেরী, তুরী, দুন্দুভী, দমামা।
- রামচন্দ্রের নির্দেশে সাড়াদিয়েছিল যারা - সুগ্রীব, অঙ্গদ, নল, নীল, হনুমান, জাম্বুবান, শরভ এসে উপস্থিত হন।
- রাবণে যুদ্ধযাত্রায় সৈন্য দলের ব্যবহৃত অস্ত্র - শেল, শক্তি, জাটি তোমর, ভোমর, শূল মুষল, মুদগর পট্টিশ নারাচ, কৌন্ত।
- মহাশক্তি অস্ত্র হেনে রাবণ লক্ষ্মণকে প্রাণহীন করেন।

❖ **উল্লেখযোগ্য পংক্তি ঃ**

- ‘‘. . . . ছদ্মবেশে পশি / নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে সৌমিত্রি, কেশরী।’’
- ‘‘. . . . দেহ পদধূলি / জননী ; নিঃশঙ্ক দাস তোমার প্রসাদে -’’
- ‘‘ . . . . হায়; প্রভু দুরন্ত সংহারী
  ত্রিশূলী; সতত রত নিধনসাধনে!
- হেথা পরাভূত যুদ্ধে; মহা-অভিমানে / সুরদলে সুরপতি গেল সুরপুরে।’’

অষ্টম সর্গ (প্রেতপুরী)

মহাশক্তি অস্ত্রে নিহত লক্ষণের শোকে ভক্ত রামচন্দ্রের বেদনা অনুভব করে বিষন্ন গৌরী মহাদেবের প্রতি আভিমানী হলে মহাদেব গৌরীকে লক্ষণের পুনজীবনের উপায় জানার জন্য প্রেতপুরীতে গমন করেন। শিবের ত্রিশূলের সহয়তা নিয়ে মায়া রামচন্দ্রকে তমসাময় প্রেতপুরীতে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় মহাদেবের ত্রিশূল প্রেতপুরীতে অগ্নিস্তম্ভের ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। প্রেতপুরীতে পরিখা রূপে বৈতরনী নদী প্রবাহিত। বৈতরণী নদীতে রামচন্দ্র যে সেতু প্রত্যক্ষ করেন তা কামরূপী সেতু। ধর্মপথগামী ব্যক্তিরা সেতু পথে উত্তর পশ্চিম ও পূর্বদ্বারে যায় এবং পাপী যারা তার নদী সাঁতারে যমদূতের আসহ্য পীড়ন সহ্য করে নদী পার হয়। বৈতরণী সেতুর নিকটে রামচন্দ্র যমদূত দন্ডপানিকে প্রত্যক্ষ করেন। প্রেতপূরীর দক্ষিণ দুয়ারে চুরাশি নরক বর্তমান। যে ব্যক্তি পরধন হরণ করে, যে বিচারক অবিচার করে যে সমস্ত প্রাণী মহাপাপী তারা নরক ভোগ করে। আবার তপ্ত তেলে সমদূত পাপীদের নরকে ভাজে অর্থাৎ বিভিন্ন পাপের ভিন্ন ভিন্ন সাজা রামচন্দ্র দেখেছেন।

- রৌরব হ্রদ - জল রূপে এই অগ্নি প্রবাহিত হয়।
- কুম্ভীপাক - তপ্ত তেলে যমদূত পাপীদের এই নরকে ভাজে।
- প্রেতপুরীতে রামচন্দ্রের সঙ্গে যে প্রেতের দেখা হয়েছিল তার নাম - মারীচ
- বিলাপবন সেখানে প্রেতেরা কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা ও কান্নাকাটি করে যে যার নরেকে ফিরে যায়।
- প্রেতপুরীর পূর্বদ্বারে পতিসহ পতিপরায়না নারীগণ বাস করেন।
- উত্তর দুয়ারে সম্মুখ সমর যে সমস্ত বীরেরা মৃত্যুবরণ করে তাদের বাস।
- যমরাজ দশরথকে লক্ষণের প্রাণদানের উপায় বলে দেন।

❖ **উল্লেখযোগ্য পংক্তি ঃ**

- কহিলা বিষাদে মায়া রাঘব সম্ভাষি -
  'রৌরব এ হ্রদ নাম শুন রঘুমণি,
  অগ্নিময় ! পরধন হরে যে দুর্ম্মতি,
  তার চিরবাস হেথা . . .''
- '. . . এই প্রেতকুল, শুন রঘুমনি,
  নানা কুন্ডে করে বাস ; কভু কভু আসি
  ভ্রমে এ বিলাপবনে, বিলাপ নীরবে।''
- '' . . . পশ্চিম দুয়ারে / বিরাজেন রাগ ঋষি রাজ ঋষিদলে''
  ''কীর্ত্তিমান! বংশ মম উজ্জ্বল ভুতলে / তবগুনে গুনিশ্রেষ্ঠ! ওই যে দেখিছ / স্বর্নগিরি''
- ''পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে-''
- ''বিদায়ি ছটায়ূ শূলে, চলিলা একাকী
  - - - - - - - - - - - - - - -
  বৈতরণী নদীতীরে, পীযুষ সলিলা / এ ভূমে ;''
- ''অন্ত্যেষ্টি ব্যতীত / নাহি গতি গতি এ নগরে হে বৈদেহীপতি''
- ''হায় রে বিধাতঃ / নির্দ্দয় ; সৃজিলি কিরে আমা সবাকারে এই হেতু - - ।''
- ''চল, রথি, চল দেখাইব / কুম্ভিপাকে ; তপ্ত তৈলে যমদূত ভাজে / পাপীবৃন্দে যে নরকে --।''

নবম সর্গ (সংক্রিয়)

মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও প্রমীলার সহমরণই সংক্রিয় পর্বের বিষয়। রাবণ ইন্দ্রজিতের অন্তেষ্টি ক্রিয়ার জন্য সচিব শ্রেষ্ঠ সারণ রামচন্দ্রের কাছে সাত দিন যুদ্ধ বিরতি প্রার্থণা করেন। ত্রিছটা রাক্ষসী অশোক কাননে সীতাকে হত্যা করতে উদ্যত হলে চেড়ীদল মিলে তার ক্রোধ হরণ করে। সতী হওয়ার পূর্বে প্রমীলার শেষ ইচ্ছা সখী বাসন্তী যেন দৈত্যদেশে ফিরে গিয়ে পিতা মাতার কাছে স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জনের সংবাদ দান করেন। রামের নির্দেশে মেঘনাদের অন্তেষ্টিক্রিয়ায় অঙ্গদ এক হাজার সৈন্যসহ যোগ দান করেছিলেন। আকাশের দেবদেবীগণ তার সাক্ষী রইলেন। চিতার আগুন দুধ দিয়ে নেভানো হয়েছিল এবং মেঘনাদের চিতার স্থলে রক্ষঃ শিল্পী মিলে গগনচুম্বী মঠ নির্মান করে।

- দুর্গার অনুরোধে শিব শ্রীরাম-লক্ষণকে ক্ষমা করেন।
- অগ্নিদেবকে অগ্নিশুদ্ধ করে দ্রুত মেঘনাদ-প্রমীলাকে দিব্যরথে স্বর্গে আনয়নের নির্দেশ দেন।

❖ **উল্লেখযোগ্য পংক্তি ঃ**

- ''কে বুঝে দেবের মায়া এ মায়ার সংসারে,
  রাজেন্দ্র? গন্ধমাদন, শৈলকুলপতি - - -।''
- ''বিধির বিধি কে পারে খন্ডাতে?''
- ''প্রেতক্রিয়াহেতু, সতি! সপ্ত দিবানিশি
  না ধরিবে অস্ত্র কেহ এ রাক্ষস দেশে।''
- ''বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে
  সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।।''

Sub Unit - 3
সাধের আসন
বিহারীলাল চক্রবর্তী

বাংলা কাব্যের নব যুগে প্রকৃতির নতুন পরিচয়ের একদিক যেমন মধুসূদনের রূপ পেয়েছে। তেমনি ওর বিপরীত ধর্মী আর একটা দিক বিহারীলাল চক্রবর্তী। তিনিই প্রথম সার্থক গীতি কবির ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত। বিহারীলাল কৃত্রিম ক্লাসিক যুগের আবসান ঘটিয়ে তাঁর কাব্যে রোমান্টিকতার জয় ঘোষণা করেছেন। তিনিই প্রথম গীতি কবিতার প্রতি সর্বাত্মক ভাবে আকৃষ্ট হন এবং আত্মভাব উদ্বোধনের চেষ্টা করেন।

রোমান্টিক গীতিকবিতার যৌবনমুক্তি বিহারীলালের হাতেই। জনাকীর্ণ জীবনের সংগ্রামরত বাংলার কাব্যভাবনার জগতে মন্ময় কল্পনার প্রথম সংবাদ বিহারীলাল মৃদুকণ্ঠে বহন করেছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যগুরু বিহারীলালকে 'ভোরের পাখি' আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন। অন্য দিকে 'নব্য ভারত' পত্রিকায় 'কবি বিহারীলাল' প্রবন্ধে ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন ''ধ্যানই এই কবির কবিত্বের প্রান, পরমাত্মা''। অর্থাৎ গীতিকবিতার যে ধ্যানময়তা থেকে জাত তন্ময়তা তা তাঁর গীতিপ্রাণ তাকে যে উদ্বুদ্ধ করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২১শে মে (৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৪২ বঙ্গাব্দ) কলকাতার জোড়াবাগান অঞ্চলে কবি বিহারীলালের জন্ম। বিহারীলাল এই নামটি সম্পর্কে সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গলা-সহিত্যের ইতিহাস'এ (দ্বিতীয় খন্ড) লিখেছেন, ''ইনি স্বাক্ষর করিতেন, 'বেহারীলাল'। বস্তুত নামটি বেহারীলাল চক্রবর্তী হওয়া উচিত। সাধুভাষার খাতিরে (এবং রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন বলিয়া) আমরা 'বিহারীলাল' লিখিয়া আসিতেছি।''

তথ্য

- বিহারীলাল চক্রবর্তীর পিতার নাম - দীননাথ চক্রবর্তী। ইনি পৌরোহিত্যের কাজ করতেন।
- বিহারীলালের পিতৃব্য দ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহাধ্যায়ী ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিক্ষক।
- বিহারীলালের বংশের প্রকৃত উপাধি চট্টোপাধ্যায়।
- দেবনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন বিহারীলালের সংস্কৃত শিক্ষক এবং রামকমল ভট্টাচার্য ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ছিলেন ইংরেজি শিক্ষক।
- ১৮৫৪ খ্রিঃ কবির প্রথম বিবাহ হয় অভয়া দেবীর সঙ্গে এবং ১৮৬০ সালে কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ হয়। কাদম্বরী দেবী ছিলেন নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় কন্যা।
- বিহারীলাল চক্রবর্তী পুরাতন যুগের বাংলা সাহিত্যের দশুরায় ও ঈশ্বরগুপ্তের ভক্ত পাঠক ছিলেন।
- বিহারীলাল চক্রবর্তী কয়েকটি প্রত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন-

  ক) 'পূর্ণিমা' ১৮৫৯ খ্রিঃ ৭ই ফেব্রুয়ারি মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা করেন।

  খ) পূর্ণিমা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর যোগেন্দ্রনাথ দাস ঘোষের সহযোগিতায় 'সাহিত্য সংক্রান্তি'(১৮৬০) মাসিক পত্রিকা প্রকাশ পায়।

  গ) ১৮৭৬ খ্রিঃ বিহারীলালের বন্ধু ড. যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ 'অবোধবন্ধু' (নবপর্যায়) নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরে (সম্ভবত ১২৭৬ সাল) বিহারীলাল এর সম্পাদক হন। অর্থাভাবে ৩ বছর পর (১৮৭০) পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।
- 'অবোধবন্ধু' (পত্রিকাতে) প্রকাশিত বিহারীলালের কবিতা 'বালক' রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত আকর্ষন করেছিল।

❖ কাব্যগ্রন্থ ঃ

১) 'স্বপ্নদর্শন' -(গদ্যরূপ কাব্য) -১৮৫৮ - পূর্ণিমা পত্রিকায় প্রকাশিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় ১৮৫৮ খ্রিঃ ৩রা আগস্ট এই গদ্যাংশের প্রশংসা করেন।

২) 'সঙ্গীত শতক' - ১৮৬২ খ্রিঃ

৩) 'বঙ্গসুন্দরী'- ১৮৭০ খ্রিঃ

৪) 'নিসর্গ সন্দর্শন'- ১৮৭০ [অবোধ বন্ধু পত্রিকা]

৫) 'বন্ধু বিয়োগ'- ১৮৭০ [পূর্ণিমা পত্রিকা ; ৪ জন বন্ধু এবং প্রথমা স্ত্রীর বিয়োগ ব্যাথা ব্যক্ত হয়েছে। ৪জন বন্ধু - পূর্ণচন্দ্র, কৈলাস, বিজয় ও রামচন্দ্র]

৬) 'প্রেম প্রবাহিনী'- ১৮৭০ [অবোধ বন্ধু পত্রিকা]

৭) 'সারদা মঙ্গল'- ১৮৭৯ 'শেলির কবিতা 'Hymn to Intellectual beauty' প্রভাব আছে।
৮) 'সাধের আসন' - ১৮৮৯ [মালঞ্চে প্রকাশিত ১২৯৫-৯৬, 'প্রদীপে প্রত্রিকাতে বাকি অংশ - ১৩০৬]
৯) 'বাউল বিংশতি' - ১৮৮৭ সালে 'কল্পনা' পত্রিকায় অংশত প্রকাশিত।

- কবিপুত্র অবিনাশচন্দ্র সম্পাদিত গ্রন্থাবলীতে পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত কতকগুলি রচনা স্থান পেয়েছে - 'মায়াদেবী'; 'শরৎকাল'; 'ধুমকেতু'; 'দেবরানী'; 'বাউল বিংশতি'; 'কবিতা ও সঙ্গীত'।
- ১৮৯৪ সালে ২৪শে মে (১৩০১ বঙ্গাব্দে ১১ জ্যৈষ্ঠ) বহুমূত্র রোগে বিহারীলালের মৃত্যু হয়।
- দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন বিহারীলাল।
- কবি বিহারীলালের পুত্র শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ১৯০১ খ্রিঃ ১৫ জুন (১ আষাঢ়, ১৩০৮) রবীন্দ্রনাথের প্রথম সন্তান মাধুরীলতার (বেলা) বিবাহ হয়।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আধুনিক সাহিত্য বিহারীলাল চক্রবর্তীকে 'ভোরের পাখি' বলেছেন।
- অক্ষয়কুমার বড়াল তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন, এছাড়াও সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের মধ্যে যৎসামান্য এবং দেবেন্দ্রনাথ সেনের রচনা ও ভাবভঙ্গিমায় তাঁর কিছু বেশি প্রভাব আছে।
- বিহারীলালেরর মৃত্যুর পর অক্ষয়কুমার বড়াল যে শোকগীতিটি রচনা করেন তা হল-

এসেছিলে শুধু গায়িতে প্রভাতী
না ফুটিতে উষা, না পোহাতে রাতি,
আঁধারে আলোকে প্রেমে মোহে গাঁথি,
কুহরিল ধীরে ধীরে।
ঘুম ঘোরে প্রণী ভাবি স্বপ্নবাণী,
ঘুমাইল পার্শ্ব ফিরে।

❖ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মন্তব্য ঃ

- ''কবি বিহারীলালের হাড়ে হাড়ে প্রাণে প্রাণে কবিত্ব ঢালা থাকিত।'' [দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর]
- ''বিহারীলাল যত বড় ভাবুক ছিলেন তত বড় কবি ছিলেন না।'' [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]
- ''সারদা এক এবং অদ্বয় সে কবি হৃদয়ের গভীর অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং দৃঢ় বিশ্বাস''- [শশীভূষণ দাশগুপ্ত 'সারদামঙ্গল' কাব্য সম্পর্ক]
- ''বিহারীবাবু সর্বদাই কবিত্বে মশগুল থাকিতেন; তাঁহার হাড়ে হাড়ে প্রাণে প্রাণে কবিত্ব ঢালা থাকিত ; তাঁহার রচনা তাঁহাকে যত বড় বলিয়া পরিচয় দেয়, তিনি তাহা অপেক্ষা অনেক বড় কবি ছিলেন।'' [দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর]
- '' 'সাধের আসন' কবির আত্মজৈবনিক রচনা। অবশ্য গীতি-কবিতার মধ্যে সর্বদাই আত্মজৈবনিক উপাদান থাকে।'' [আলোক রায়]
- ''বিহারীলালের কবিদৃষ্টি কাব্যসৃষ্টিতে সার্থক হইতে পারে নাই ; তাঁহার কাব্য তত্ত্বরসের (মিষ্টিসিজম) আধার হইয়া আছে - সে রসকে তিনি রূপ দিতে পারেন নাই। তাই তিনি প্রকৃত কবি না হইয়া মিষ্টিক হইয়াই রহিলেন।'' [মোহিতলাল]

সাধের আসন (১৮৮৯)

- জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী কাদম্বরী দেবী স্বহস্তে একখানি আসন নির্মাণ করে কবিকে উপহার দেন। এই উপলক্ষে 'সাধের আসন' রচিত হয়।
- ''সারদামঙ্গলের পরিপূরক কাব্য হল 'সাধের আসন' ''
- '' 'সাধের আসন' কাব্যটি রচনার পশ্চাতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবীর অনুরোধ ও প্রেরনার কথা বিহারীলাল কাব্যের ভুমিকায় উল্লেখ করেছেন।

''কোন সম্ভ্রান্ত সীমন্তিনী আমার 'সারদামঙ্গল' পাঠে সন্তুষ্ট হইয়া চারি মাস যাবৎ স্বহস্তে বুনিয়া একখানি উৎকৃষ্ট আসন আমাকে উপহার দেন। এই আসনের নাম 'সাধের আসন'। সাধের আসন অতি সুন্দর সুন্দর অক্ষর বুনিয়া সারদামঙ্গল হইতে এই শোকার্ধ উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

''হে যোগেন্দ্র! যোগাসনে
ঢুলু ঢুলু দুনয়নে

বিভোর বিহ্বল মনে কাঁহারে ধেয়াও?''

- ‘সাধের আসন’ ১২৯৫ ফাল্গুন থেকে ১২৯৬ সালের মাঘ মাস পর্যন্ত ৪টি সর্গ মালঞ্চ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, বাকি অংশ ‘প্রদীপ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
  প্রথম সর্গ (১৭-২৮ শ্লোক বাদে) - মালঞ্চ, ফাল্গুন ১২৯৫
  দ্বিতীয় সর্গ - মালঞ্চ, চৈত্র ১২৯৫ [প্রসঙ্গত উল্লেখ্য
  তৃতীয় সর্গ - মালঞ্চ, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬ মালঞ্চ ঠাকুরদাস
  চতুর্থ সর্গ - মালঞ্চ, পৌষ-মাঘ ১২৯৬ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদিত পত্রিকা]
- এই কাব্যে মোট ১০ টি সর্গ ৫টি গান আছে। এছাড়া এই কাব্যের শেষে উপসংহারও শান্তিগীত সন্নিবেশিত হয়েছে।
- ‘সাধের আসন’ কাব্যের সৌন্দর্য লক্ষ্মীর উপর দেবী ভাগবতের চন্ডীতত্ত্ব আরোপিত হয়েছে।
- চতুর্থ সর্গে নন্দন কাননের স্বপন দেখার সময় হঠাৎ কৃষ্ণ যশোদার বাৎসল্য রসের আগমন ঘটেছে।

❖ **গান ঃ**

গানের সংখ্যা	গানের নাম	রাগিনী	তাল	গানের স্থান	প্রথম লাইন	শেষ লাইন
১	কিন্নর গীতি	কালাংড়া	ঝাঁপতাল	৮ম সর্গের শেষে	মধুর মধুর তোর রূপ যামিনী	আকাশ পাতাল একাকার একাকিনী
২	×	ললিত	কাওয়ালী	নবম সর্গের সূচনা	প্রান কেন এমন করে, (আমার)	কি জানি কি আভিমান ভরে
৩	×	ললিত	কাওয়ালী	দশম সর্গের সূচনা	আহা সম্মুখে সুমঙ্গল একি!	দেরি দাঁড়াও নয়ন ভোরে দেখি!
৪	শোক সঙ্গীত	×	×	উপসংহারে শেষে	ফুল ফোটে না আর সাধের বাগানে, উল্লেখ নেই	মুকুলে মরিয়া যায় ব্যথা দিয়ে প্রাণে।
৫	শান্তিগীতি	ললিত ভৈরব	তেতালা	কাব্যের শেষে	প্রেমের সাগরে ফুলতরণী	চির বিকশিত নলিনী!

সর্গ সংখ্যা	কবিতার নাম	স্তবক	প্রথম লাইন	শেষে লাইন
১ম সর্গ	মাধুরী	৩০	‘ধেয়াই কাহারে দেবী নিজে আমি জানি না’।	মানব মনের তুমি উদার সূচনা। **সংস্কৃত শ্লোক** ‘যা দেবী সর্বভূতেষু কান্তি রূপেন সংস্থিতা নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।''
২য় সর্গ	গোধুলি, নিশিথে	৬+১৫ মোট - ২১	সুশান্ত গোধুলি বেলা।	বল গো মা বল বল, কর তুমি করুণা!
৩য় সগ	প্রভাত ও যোগেন্দ্রবালা	৭+৯ মোট -১৬	মধুর, মধুর, আহা, কে ললিত গায় রে!	সজল নয়নে শুধু চেয়ে আছি রাঙা পায়।
৪র্থ সর্গ	নন্দন কানন	২৫	দিগন্ত-ললাট-পটে সাধের নন্দন বন	দেখিগে যোগেন্দ্রবালা যোগ-ভোলা নয়নে।
৫ম সর্গ	অমরাবতীর প্রবেশপথ	১৬	দৃষ্টিপথ-প্রান্তভাগে ওই কি অমরাবতী?	দেখিগে যোগেন্দ্রবালা যোগ-ভোলা নয়নে!

৬ম সর্গ	কে তুমি?	২৩	কে ওই, আসিছে পথে! পারিজাত পুষ্পরথে;	দেখিতে দেখিতে হই কালের সাগরে লীন!
৭ম সর্গ	মায়া	৩৩	একি, একি, একি মায়া সমুখে মানবী কায়া	দেখিগে যোগেন্দ্রবালা যোগেভোলা নয়নে।

❖ উল্লেখযোগ্য পংক্তি ঃ

- ধেয়াই কাঁহারে দেরি! নিজে আমি জানিনে
  কবি গুরু বাল্মীকির ধ্যান ধনে চিনিনে। [১ম সর্গ]
- ভোরে শুকতারা রাণী কি যেন দেখায় আনি
  বুঝিতে পারিনা, শুধু আঁখি ভরি দেখি তায়। [১ম সর্গ]
- সুশীতল সমীরণ, কোথা ছিল এতক্ষন?
  জুড়াল শরীর মন, জুড়াইল ধরনী,
  ফুটিল গোলাপ ফুল, ঘুমাইল নলিনী। [২য় সর্গ]
- চলে মেঘ সারি সারি, গুঁড়ি গুঁড়ি পড়ে বারি,
  কনক-বরনী উষা লুকাল কোথায় রে! [৩য় সর্গ]
- কিবে মন-মুগ্ধ কারী কল্পতরু সারি সারি,
  দাঁড়ায়েছে অতিথির পূরাইতে কামনা! [৪র্থ সর্গ]
- মহেশের দেত্রাত্র গানে যান ব্যোম গঙ্গাস্নানে।
  'হর হর মহেশ্বর!' উঠিছে শঙ্কর স্বর। [৫ম সর্গ]
- কেন পতিব্রতা মেয়ে! আমারও পানে চেয়ে
  করুণ নয়নে তব ভরিয়া অসিল জল? [৬ম সর্গ]
- কি দেখে আমার মুখে মায়ে ঝিয়ে হাস সুখে?
  অতিথিজনের প্রতি কৃপা বুঝি হয়েছে? [৭ম সর্গ]
- প্রসন্না করুণাময়ী দিলে পুত্র ইন্দ্রজয়ী
  রঘুবং-প্রতিষ্ঠাতা রঘু বীরবরে। [৭ম সর্গ]

Teachinns Text with Technology

প্রথম সর্গ (মাধুরী)

কাদম্বরী দেবীর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সাধের আসনের আসন পেতেছেন কবি। কবি নিজেও জানেন না তিনি কার ধ্যান করছেন। কবি তার স্বপ্নরূপিনীকে যুবতী সতীর সাথে তুলনা করেছেন। কবি মনে করেছেন এই স্বপ্নরূপিনীই হয়তো আমাদের জননী পিতা স্ত্রী বন্ধু। তাই কখনো তিনি স্নেহ, প্রেম, ভক্তি, রস-এর সম্বন্ধে আমাদের আবদ্ধ করে রেখেছেন। কবি মহামায়ারূপী সৌন্দর্যের ভাবে বিহ্বল। আর তাকে লাভ করতে চান কবি। এ সমস্ত বিষয় এই স্বর্গে স্থান পেয়েছে।

- এই সর্গের স্তবক সংখ্যা ৩০টি
- স্বপ্নরূপিনীকে সতীর সঙ্গেও বিশ্বরূপিনীকে মা রূপে সম্বোধন করেছেন।
- এই সর্গের সংস্কৃত মন্ত্র - ''যা দেবী সর্বভূতেষু কান্তি রূপেন
  সংস্থিতা নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ
  নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।''

❖ উল্লেখযোগ্য পংক্তি ঃ

- ধেয়াই কাঁহারে, দেবি! নিজ আমি জানিনে
  কবিগুরু বাল্মীকি ধ্যান ধনে চিনিনে।
- ভোরে শুকতারা রানী কি যেন দেখায় আনি
  বুঝিতে পারিনা, শুধু আঁখি ভরি দেখি তায়।
- কে তুমি, মা কান্তিরূপে সর্বভুতে বিভাষিতা?

- আহা সেই রক্ত রবি; তোমারি পদাঙ্গ-ছবি!
  জগতে কিরণ দেয় তোমারি কিরণে।

দ্বিতীয় সর্গ (গোধুলি নিশীথে)

সর্গটি শুরু হয়েছে সূর্যের অস্ত যাওয়ার বর্ণনা দিয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। আকাশে চাঁদ; তারা ফুটে উঠেছে। মায়ের কোলে বসে শিশু সেই দৃশ্য দেখেছে। মাতৃ বন্দনা করেছেন কবি। তাই কবি এই সর্গে বলেছে - দাঁড়াও সৌন্দর্যময়ী মা আজ তোমার চরণ ধরে সুশীতল অশ্রুজলে ধুয়ে তোমাকে পূজা করব। প্রাণের যত সাধ আছে এই মিটিয়ে নেবেন কবি।

- মনথরগামিনী মানে ধীর গতিতে।
- মোট স্তবক সংখ্যা ২১ (গোধূলি-৬, নিশীথে-১৫)
- গোধূলি ও নিশীথে দুটি কবিতা রয়েছে।

❖ উল্লেখযোগ্য পংক্তি ঃ

- বসিয়া মায়ের কোলে আদর করিয়া দোলে
  আকাশের পানে চায় তারা ফোটে দেখিতে
- সুশীতল সমীরণ, কোথা ছিল এতক্ষণ?
  জুড়াল শরীর মন, জুড়াইল ধরণী
- হৃদয় আজি রে কেন আকুল হইল হেন!
  কতকাল দেখি নাই মায়ের স্নেহের মুখ;
- আজ আমার শুভ দিন ঘটিয়াছে ভাগ্যাধীন
  পূরাব প্রাণের সাধ জুড়াব তাপিত মন।

তৃতীয় সর্গ (প্রভাত)

ভোরের আগমন ঘটে। ফুলরাণী যেন ঘুম থেকে জেগে উঠেছেন। চারিদিক পাখির গানে আকাশ সুরময় হয়েছে। সৌন্দর্যের ব্যাপ্তি অনুভব করেছেন কবি। কবির ইচ্ছা অমৃতময় সাগরে ভেসে ভেসে নলিনী পদ্মতুলে এসে দেবীর পা দুখানি সাজান। সৌন্দর্যের অসীম ব্যাপ্তি অনুভব করেছেন যোগেন্দ্রবালার মধ্যে। কবির দিব্য দৃষ্টির সন্মুখে সারদা উদ্ভাসিত।

- প্রভাত ও যোগেন্দ্রবালা নামে দুটি কবিতা
- প্রভাত কবিতায় স্তবক সংখ্যা ৭টি এবং যোগেন্দ্রবালা এর স্তবক সংখ্যা ৯টি মোট ১৬টি স্তবক।
- ললিত রাগের উল্লেখ রয়েছে।

❖ উল্লেখযোগ্য পংক্তি ঃ

- উল্লাসে মাঠের কোলে তৃণের তরঙ্গ দোলে
  কাশের চামরগুলি সোহাগে গড়িয়ে যায়।
- আরবি অরুন-কায়া দিকে দিকে মেঘমায়া
  বিচিত্র মেঘ-মন্দিরে কার এই রূপরাশি
- অমৃত সাগরে ভাসি, মৃদুমন্দ হাসি হাসি
  আদরে আদরে তুলি, নীল নলিনী আমি,
- আমিও এনেছি বালা! প্রেমের প্রফুল্ল মালা
  সৌরভে আকুল হয়ে পারিনি পরাতে গায়;
  সজল নয়নে শুধু চেয়ে আছি রাঙা পায়।

চতুর্থ সর্গ (নন্দন কানন)

কবি সাধের নন্দন বনকে স্বপ্নে দেখেছেন। যেখানে ফুটে রয়েছে পারিজাত, নীল আকাশে যেন শুকতারা উঠেছে। কবি নিজেই যেন নন্দনবনে ঘুমিয়ে পড়ে ছিলেন। হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই তিনি দেখেন আলুথালু বেশে প্রিয়া যেন ঘুমাচ্ছে। প্রিয়ার মুখখানি যেন স্নেহমাখা, ত্রিলোক সৌন্দর্যময়ী। কবি চোখ বুজেও সেইরূপ দেখতে পান। কবি সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে সচ্চিদানন্দ বলে মনে করেছেন।

- পারিজাত মানে স্বর্গীয় ফুল।
- 'কল্পতরু'র (যে স্বর্গীয় বৃক্ষের কাছ থেকে আকাঙ্খিত ফল লাভ করা যায়) উল্লেখ রয়েছে।
- এই সর্গের স্তবক সংখ্যা ২৫।

❖ উল্লেখযোগ্য পংক্তি ঃ

- অপূর্ব সৌরভময় কি সুখ সমীর বয়!
  পুলকিত মনপ্রাণ সাধ যায় দেখিতে
- কিবে মন মুগ্ধ করী কল্পতরু সারি সারি
  দাঁড়ায়েছে অতিথির পূরাইতে কামনা!
- ওই চাঁদ অস্তে যায়, বিহঙ্গ ললিত গায়
  মঙ্গল আরতি বাজে নিশি আবসান
- স্মরি সেই ব্রজলাল আসি নটবর কালা
  ধীর সমীরে
  যমুনা তীরে।

পঞ্চম সর্গ (অমরাবতীর প্রবেশপথ)

কবি বিচিত্র মূর্তি ও উদার জ্যোতির্ময়ী অমরাবতীকে দেখেছেন। শ্রুতিমধুর গান যেন অমরাবতীকে মুখর করে রেখেছেন। আর সেই গান শুনে নন্দনবনে দেবদেবীরা মনের আনন্দে ঘুমিয়ে পড়েছে এরপর কবি অমরাবতী অবস্থানকারী কন্যাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন তারা তাদের নরম হাতে ফুল তোলে, গদগদ ভক্তিভরে লাস্যময়ী মুখে মালা গেঁথে চলে।

- 'কামধেনু'র (ইচ্ছাপুরণ করা গাভী) উল্লেখ আছে।
- এই সর্গের স্তবক সংখ্যা ১৬

❖ উল্লেখযোগ্য পুংক্তি ঃ

- দু ধারে করিছে খেলা যূথিকা চামেলি বেলা
  দু ধারে মন্দার তরু দূরে দূরে দাঁড়ায়ে।
- নন্দিনীর তাম্র গায় চেটে চেটে চুমো খায়;
  মানুষের মত আহা চুমো খেতে জানে না!
- মহেশের স্তোত্র গানে যান ব্যোম গঙ্গাস্নানে
  হর হর মহেশ্বর! উঠিছে শঙ্কর স্বর।
- তোমাদের পানে চেয়ে হৃদয় জড়িত স্নেহে;
  চলিতে চলে না পা, চক্ষু ফিরে আসে না।
- যাই, বাছা ফিরে যাই সে কমল কাননে ;
  দেখিগে যোগেন্দ্রবালা যোগ-ভোলা নয়নে!

ষষ্ঠ সর্গ (কে তুমি)

এই সর্গে কবিতার সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে কখনও উষারূপে আবার কখনও অমরাবতীর পবিত্রতা সতীরূপে দেখেছেন। এই সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে লক্ষ করে কবি মনে এক স্মৃতিপট ফুটে উঠেছে। কিন্তু কবিমনে সেই স্বপ্ন ফুটে উঠে না তার জন্য তিনি আক্ষেপ করেছেন। সেই সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে কবি দুর্গার সাথে তুলনা করেছেন। যাকে বিজয়ার দিনে বিদায় দিয়ে সকলের মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। তার মুখ দেখতে দেখতেই এতকাল পেরিয়ে নতুন কালের আগমন ঘটেছে। এই পথে কবি প্রত্যক্ষ করেন কোন পতিব্রতা সতী নারীকে। অমরাবতীর পথে গিয়েও মর্ত্যের মানবী বিয়োগ ব্যথা তাকে পীড়িত করেছে।

- এই সর্গে স্তবক সংখ্যা ২৩
- ত্রিতাপ (আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক) এর উল্লেখ রয়েছে।
- ত্রিদিব (স্বর্গ) এর উল্লেখ রয়েছে।

- দিগঙ্গনা (দিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী) এর উল্লেখ আছে।

❖ **উল্লেখযোগ্য পংক্তি ঃ**

- কে ওই আসিছে পথে! পারিজাত পুষ্পরথে;
  আগে আগে নভস্থান্ গায় আগমনী গান;
- সাধ্বী পতিব্রতা সতী! সুখেতে রা করগতি!
  তব আশুকণাটুকু অমৃত-অধিক ধন
- নির্জনে গাঁথিয়া মালা, পূজিগে যোগেন্দ্রবালা
  ফিরেও ফিরিতে নারি, কি যেন আটকে পায়।
- অয়ি অয়ি সরস্বতী! তব পাদপদ্মে মতি
  নির্মলা অচলা হয়ে থাকে যেন চিরদিন।

সপ্তম সর্গ (মায়া)

কবি সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে এখানে মায়ারূপে কল্পনা করেছেন যিনি তার কেশ পাশ মধুর হাসিতে ভরিয়ে তুলেছে। মায়ের কোলে সেই ভুবনমোহিনী আনন্দে নৃত্য করে। মানব-দানব রাক্ষঃ সবাই প্রার্থনা করে এ দেবীকে কাছে পেয়েছে, কবি সামান্য মানুষ হয়ে তার প্রার্থনা আজও অসম্পূর্ণ কবির প্রার্থনা পূরণ না হওয়ার মায়ার উদ্দেশ্য বিভিন্ন সম্বোধন করে তার যন্ত্রণার কথা উল্লেখ করেছেন।

- এই সর্গে ৩৩টি স্তবক রয়েছে।
- রাজা দিলীপের নাম উল্লেখ আছে।
- ত্রিকুল (পিতা, মাতা ও শ্বশুর কল) এর উল্লেখ রয়েছে।
- কপিলা বুড়ির উল্লেখ আছে।

❖ **উল্লেখযোগ্য পংক্তি ঃ**

- মায়ে ঝিয়ে হাসিখুসি, মূর্তি কিবা অকলুষী!
  দেখিতে দেখিতে, কই কোথায় মিলিয়ে গেল!
- এখন বল কি করি হে গোধন-কুলেশ্বরী!
- প্রভাব যে কি বিচিত্র বুঝেছেন বিশ্বামিত্র।
  কর গো কাতর প্রতি কৃপাবলোকন!
  নিদয় হয়ো না দেবী মায়ের মতন।
- প্রসন্না করুণাময়ী দিলে পুত্র ইন্দ্রজয়ী
  রঘুবংশ প্রতিষ্ঠাতা রঘু বীরবরে।
- এখনো সে মুখখানি হেরিতে আকুল প্রাণী
  নাহি জানি কি সম্বন্ধ আছে তাঁর সনে।

অষ্টম সর্গ (শশিকলা স্থির সৌদামিনী, বীণা এবং কিন্নরগীতি)

কুঞ্জবন পরিবৃত মন্দাকিনী বাসন্তী সৌরভময় পাখির কলতানে মগ্ন অনন্ত যৌবনময় শশিকলার বর্ণনা কবি এই অংশ দিয়েছেন। কবি গানের মধ্যে দিয়ে নির্দিষ্ট রাগিণী ও তালের সমন্বয়ে শশিলতার রাত্রির অন্ধকার নক্ষত্রময় আকাশে যে অপূর্ব মোহিনীময় রূপ নিয়ে উদ্ভাসিত হয় তার কথা বলেছেন।

- এই পর্বে ৩টি গান রয়েছে। স্থির সৌদামিনী কবিতায় স্তবক সংখ্যা ৫ 'শশিকলা' কবিতায় স্তবক সংখ্যা ২ 'বীণা' কবিতায় স্তবক সংখ্যা ৪ মোট স্তবক সংখ্যা ১১।
- এই সর্গে কিন্নরিগীতি নামে একটি গান আছে।

❖ **উল্লেখযোগ্য পংক্তি ঃ**

- আলুথালু চুলগুলি বাতাসে খেলায় খুলি,
  ফুটেছে মনের হাসি অসাময়িক আননে।
- পাছে কেহ দ্যাখে তাকে সদাই লুকায়ে থাকে
  ফটিক জলের ঘরে মেঘের নিবিড়ে বনে।
- তোরা গানে ঢেলে প্রাণ কিন্নরে ধরেছে গান।
  মেঘের মৃদঙ্গ বাজে, তুমি তার দামিনী ;
- তারকা-কুসুম-বনে খেলিছে আপন মনে,
  কি যেন দেখি স্বপনে মায়ার মোহিনী।
- বিগলিত কেশাপাশে কতই কুসুম হাসে
  নাচিছে আছরে মেয়ে গিরি-নির্ঝরিণী।

নবম সর্গ (গীত আসনদাত্রী দেবী)

কবিমন তার সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে না দেখতে পেয়ে হাহাকার করে উঠেছে। এই মর্ত্যভূমি ছেড়ে অভিমান করে দেবী হয়তো কোথাও চলে গেছেন। কবি তাঁর সৌন্দর্য দেবীর জন্য যত্ন করে আসনখানি রেখেছেন। কবি সেই মুখ কখনও ভুলতে পারবেন না। অর্থাৎ এই সর্গে কবি আসনদাত্রী দেবীর বন্দনা করেছেন।

- এই সর্গে গানের স্তবক সংখ্যা ২০।
- এই সর্গে ইংরাজি, ফরাসি, বাংলার উল্লেখ আছে।
- কাদম্বরী ও সীতার উল্লেখ আছে।
- এই সর্গে ললিত রাগিণী ও কাওয়ালী তাল ব্যবহৃত হয়েছে।

❖ **উল্লেখযোগ্য পংক্তি ঃ**

- তোমার আসনখানি আদরে আদরে আনি,
  রেখেছি যতন করে, চিরদিন রাখিব।
- নিকুঞ্জ কাননে আর কোন পাখী ডাকে না!
  ভাগীরথী তীর থেকে আর বাঁশি বাজে না!
- সুন্দর মানব কেন, গোলাপ কুসুম যেন
  ঝরে যায়, মরে যায় অতি অল্পক্ষণে!
- যোগেন্দ্রবালার কাছে যে সব সঙ্গিনী আছে,
  খেলিতে তাঁদের সনে দেখেছি আমি তোমায়।
- হাসিছে অমরাবতী, হাসিতেছে ত্রিভুবন,
  হৃদয় উদয়াচল আলো হয়েছে কেমন!

দশম সর্গ (পতিব্রতা, গীত)

কবি তার সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে দেখে বলবেন তিনি মানব কায়া ত্যাগ করলেও মায়া ত্যাগ করেননি। তার করুন চোখ দুটি আজও অপরূপ রূপে উদ্ভাসিত সতীপতী পত্নী প্রেম অমর। মরনের তা মরে না। কবিতার পতিব্রতা দেবীকে এই ধরায় আসতে বারণ করেছেন। পুরুষ মন প্রাণ যৌবন দিয়ে কখনও তাকে ভালোবাসে না। পশুর মতো সে নিত্য নতুন খাদ্য চায়। পতিব্রতার উদ্দেশ্যে কবির মন্তব্য ধরায় না এসে আমরাবতী যাওয়ার জন্য প্রার্থনা।

- এই সর্গের গানের সংখ্যা ১২
- শেষে 'শান্তিগীতি' আছে।
- সংস্কৃত শ্লোক আছে - মিতং দদাতি হি পিতা মিতংভ্রাতা মিতং সুতঃ
  আমিতস্যতু দাতারং র্ভাতারং কা ন পূজয়েৎ?
- এই সর্গে ললিত রাগিণী ও কাওয়ালী তাল ব্যবহৃত হয়েছে।

❖ **উল্লেখযোগ্য পুংক্তি ঃ**

- সতীর প্রেমের প্রাণ পতি প্রতি একটান;
  অমর সে ভালোবাসা, মরণেও মরে না।
- যত সাধ ছিল মনে, পূর্ণ সেই শুভক্ষণে
  বিয়োগ-কাতর প্রাণ করুণায় সুশীতল।
- এ যে রামায়ণ কথা, সে যে সীতা স্বর্ণলতা,
  কন্যা কবি বাল্মীকির, পতি তাঁর রঘুবীর
  এ শ্লোক সীতার মুখে শুনেছি মনের সুখে।

উপসংহার

ধরাভূমিতে কবিকে তাঁর সৌন্দর্যলক্ষ্মী দেখা দিয়ে কোথায় চলে গেল? যেমনভাবে শুকতারা চলে গেছে সারদামঙ্গলরূপী দেবী তাঁর সাধের আসন পেতে হাত বাড়িয়ে দেন এবং মধুর বাক্যলাপের কথা বলেন। কবি বলেছেন যোগেন্দ্রবালার নয়ন আর সারদামূর্তি দেখলেই হৃদয় জুড়ায়। আসনদাত্রী দেবীর উদ্দেশ্যে 'শোক সঙ্গীত' রচিত হয়েছে।

- এই সর্গে স্তবক সংখ্যা ১০
- দামিনী শব্দের অর্থ বিদ্যুৎ

❖ **উল্লেখযোগ্য পংক্তি ঃ**

- দূরে দূরে স্থলে স্থলে উজ্জ্বল নক্ষত্র জ্বলে
  ঝুরু ঝুরু মধুর বাতাস
- আহা সেই দেবী সুলোচনা,
  সারদামঙ্গল গানে প্রসন্ন আননা,
- প্রাণ খুলে ধরিয়াছি গান, আপনার জুড়াইতে প্রাণ-
  গাহিতে তোমার গুনগান-
- শূন্য করি বঙ্গভূমি কোথায় রয়েছ তুমি,
  বসি কোন দিব্যলোকে চিরপূর্ণ চন্দ্রলোকে
  শ্রোত্রপুটে করিতেছ পান!
  আমার এ হৃদয়ের গান।
- শুভ স্মৃতিখানি তব জাগিতেছে অভিনব,
  কুসুমের, আতরের সৌরভের প্রায়
  তুমি চলে গিয়েছ কোথায়
  সে সব প্রফুল্ল ফুল গিয়েছে কোথায়।

শোক সংগীত, শান্তি-গীত

এই সর্গে কবি প্রেয়সীর মধ্যে সারদা, সীমার মধ্যে আর রূপের মধ্যে অপরূপকে দেখেছেন।

- এই পর্বে ললিত ভৈরবী রাগিণী ও তেতালা তাল কবি ব্যবহার করেছেন।
- 'শোক সংগীত' পর্বের মোট লাইন - ১৪টি
- শান্তি-গীত' পর্বের মোট লাইন ১৯টি।

❖ **উল্লেখযোগ্য পংক্তি ঃ**

- ফুল ফোটেনা আর সাধের বাগানে,
  মুকুলে মরিয়া যায় ব্যথা দিয়ে প্রাণে!
- প্রেমের প্রসন্ন মুখ, সারদার স্তোত্র গান;
  এ জগতে এই দুই আছে জুড়াবার স্থান!
- সৌরভেতে স্বর্গ হাসে, আকাশে থেমে দাঁড়ায়-
  দেখতে তোমায়, থেমে দাঁড়ায় দামিনী!

- কে তুমি সুষমা মেয়ে আছ মুখপানে চেয়ে
  আলো কোরে অন্তরাত্মা, আলো কোরে ধরণী।
- কে গো , বাজায় বীণা ঘুমায় প্রাণে,
  প্রাণ যে আমার, কি হয়ে যায় জানিনি!
- তোমারে হৃদয়ে রাখি সদাই আনন্দ থাকি
  আমার প্রাণে পূর্ণচন্দ্রোদয় সারা দিবা রজনী।

teachinns
Text with Technology

Sub Unit – 4
কামিনী রায় (১৮৬৪ - ১৯৩৩)

কামিনী রায় বরিশাল জেলায় বাসন্ডা গ্রামে ১৮৬৪ খ্রীঃ ১২ অক্টোবর জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পিতার নাম চন্ডীচরণ সেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আলো ও ছায়া' মাত্র ১৫ বছর বয়সে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' লাভ করেন। ১৯৩৩ খ্রীঃ ২৭শে সেপ্টেম্বর কবির জীবনাবসান ঘটে।

তথ্য

- কামিনীরায় 'লীলাবতী' নামে পরিচিত ছিলে।
- 'আলো ও ছায়া' কাব্যের পঞ্চম সংস্করন (১৯০৯) হেমচন্দ্রকে উৎসর্গ করেছিলেন।
- দ্বিতীয় কাব্য গ্রন্থ - মাল্য ও নির্মাল্য (১৯৩১)।
- কামিনী রায় ভারতের প্রথম অনার্স গ্রাজুয়েট মহিলা।
- বিহারীলাল প্রবর্তিত গীতিকবিতার ধারায় কামিনী রায় অন্যতম গীতিকবি।
- কামিনী রায়ের ছদ্মনাম 'জনৈক বঙ্গমহিলা'।

উল্লেখযোগ্য কাব্য গ্রন্থ :

পৌরানিকী (১৮৯২), অশোক সঙ্গীত (১৯১৪), দীপ ও ধূপ (১৯২৯), জীবনপথে (১৯৩০), অম্বা (১৯১৫), ঠাকুরমার চিঠি (১৯২৩)

উল্লেখযোগ্য মন্তব্য :

- আমার মনে হয় আমি কিন্তু অকাল পক্ক ছিলাম। কতকগুলি বিষয় আমি রবীন্দ্রনাথের পূর্বেই লিখিয়াছি। কিন্তু তিনি যখন লিখিয়াছেন অনেক সুন্দর করিয়া লিখিয়াছেন। [যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তকে চিঠিতে কামিনী রায় জানিয়েছেন]
- কামিনী রায় এখন এক বিস্মৃত কবি। অথচ অন্তত দুটি কবিতা লেখার কারনেই তিনি অমরত্ব দাবি করতে পারেন সুখ এবং 'মা আমার'। [বারিদবরণ ঘোষ; কামিনী রায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা]

কবিতার নাম	মূলকাব্যের নাম ও প্রকাশ কাল	প্রথম লাইন	শেষ লাইন
সুখ	আলো ও ছায়া (১৮৮৯)	নাই কিরে সুখ ? - নাই কিরে সুখ ? -	প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।
চন্দ্রপীড়ের জাগরন	আলো ও ছায়া (১৮৮৯)	অন্ধকার মরনের ছায়	অবতীর্ণ আহ্ দোঁহে ?
সে কী ?	আলো ও ছায়া (১৮৮৯)	"প্রণয়" " ছী !"	সে নাম দিও না এরে মিলতি আমার
প্রনয়ে ব্যাথা	আলো ও ছায়া (১৮৮৯)	কেন যন্ত্রনার কথা	স্বর্গমর্ত্যে কেহ নাহি দিবে বাধা দান ?
দিন চলে যায়	আলো ও ছায়া	একে একে একে হায় !	লাগে গত নিশীথের স্বপনের প্রায় ; / আর দিন চলে যায় !

সুখ

এ পৃথিবীতে কি সুখ নেই কেবল মাত্র যন্ত্রনার, পিড়া পাওয়ার জন্য জন্ম হয়েছে মানবের। যন্ত্রণায় কাঁদার জন্য কি বিধাতা মায়ায় ছলে মানবের সৃষ্টি করেছেন। পরক্ষণেই আবার বলছেন না মানুষের জন্য আছে উচ্চতর সুখ, উচ্চ লক্ষ্য, শুধু কাঁদার জন্য নরের সৃষ্টি হয়নি। সাধের বীণার তার ছিঁড়ে গেছে, সরস মুকুল শুকিয়ে গেছে। আশার প্রদীপ অকালেই নিভে গেল। ভগ্ন হৃদয়ে ভগ্ন প্রাণ আর কতকাল ধরে রাখা যাবে ? কবি বলেছেন তিনি যদি একবার বুঝতে পারতেন সংসার ঝোলা কেমন তাহলে। তিনি সংসার করতেন না। সুখের স্বপ্ন সব ভেঙে গেছে এবং বেঁচে থাকা কবির কাছে অর্থহীন মনে হয়েছে। কবি শেষে বলেছেন প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেকে আমরা পরের তরে এই ঐক্যবদ্ধ ভাবে বেঁচে থাকবো।

- ‘সুখ’ কবিতাটির মূল কাব্যগ্রন্থের নাম ‘আলো ও ছায়া’ (১৮৮৯)
- মোট চরণ সংখ্যা - ৫

উল্লেখযোগ্য পংক্তি :

- ‘সুখ’, ‘সুখ’ করি কেঁদনা আর
  যতই কাঁদিবে ততই ভাবিবে,
  ততই বাড়িবে হৃদয় ভার।
- সকলের মুখ হাসি ভরা দেখে
  পরাণ মুছিতে নয়ন ধরা?
- সকলের তরে সকলে আমরা
  প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

চন্দ্রাপীড়ের জাগরণ

বসন্তের বেলাচলে যায় চন্দ্রাপীড়কে কবি উঠতে বলে। মাস, বর্ষ শেষ হল আশা ভরা হৃদয় যেন কেঁদে অমঙ্গল না করে এই ছিল তার পন। মরনের পরে জীবনে নতুন জন্ম হয়। তাই কবি বলছেন চন্দ্রাপীড় তুমি তার ঘুমায় না আয়, অর্ধেক স্বপ্ন ও অর্ধেক চেতন এ কবির রাত কেটে যায়। চন্দ্রপীড় ও তার প্রিয়া মরণের তীরে অবতীর্ণ।

- কবিতাটি ‘আলো ও ছায়া’ (১৮৮৯) কাব্যের অন্তর্গত।
- কবিতাটির মোট পংক্তি সংখ্যা - ৫২।
- কবিতায় ‘চন্দ্রাপীড়’, ‘কাদম্বরী’, নাম উল্লেখ আছে।

teachinns Teach with Technology

উল্লেখযোগ্য পংক্তি :

- ‘অন্ধকার মরণের ছায়া
  কতকাল প্রণয়ী ঘুমায়?
- চন্দ্রাপীড়, মেল আঁখি এবে।
  দেখ চেয়ে, সিক্তোত্পল দুটি
  তোমা পানে রহিয়াছে ফুটি,
- জীবনের জনম নূতন
  মরণের মরণ সেথায়।
- “নহি স্বপ্নের মোহ?
  মরণের কোন তীরে
  অবতীর্ণ আজ দোঁহে?”

সে কি ?

প্রণয়, ভালোবাসা, প্রেম কোনো কিছুই নয়। পৃথিবীর আসক্তি বিহীন শুদ্ধ ঘন অনুরাগ, ধরনীর পাশে আত্মার বিস্মৃতি, উজ্জ্বল কৌমুদীতলের প্রান বিম্ব-অবিম্বের মধ্যে প্রাণ আপনাকে বিকিয়ে দিয়ে আপনার ‘বাস’ হৃদয় মাধুরী মেনপূর্ণ তেজোময় সেটা কি? তোমার প্রেম? তা কখনোই নয়। শত মুখে উচ্চারিত কত সে নাম একে দিওনা এটাই কবির মিনতি।

- ‘সে কি’ কবিতাটি ‘আলো ও ছায়া’ (১৮৮৯) কাব্যের কবিতা।
- কবিতায় সহ ৫টি জিজ্ঞাসা চিহ্ন (?) রয়েছে।

- কবিতাটি মোট পংক্তি সংখ্যা - ২৮

উল্লেখযোগ্য পংক্তি :

- "ভালোবাসা-প্রেম ?"
  "তাও নয়।"
  "সে কি তবে ? "
- পবিত্র পরশে যার, মলিন হৃদয়,
  আপনাতে প্রতিষ্ঠিত করে দেবালয়।
- জীবন কবিতা - গীতি, নহে আর্তনাদ,
  চঞ্চল নিরাশা, আশা, হর্ষ, অবসাদ।
- "সে নাম দিও না এরে মিনতি আমার।"

প্রণয়ে ব্যথা

ভালোবাসার সাথে জড়িয়ে কেন থাকে যন্ত্রণা নিরাশা। কন্টকাকীর্ণ প্রনয়ের পথে এত বাধা কেন? জীবনে চলার পথে একটি মনের মতো পথিক পায় নিয়তি বার বার দুটি জীবন আলাদা করে দেয়, যে বাধা লঙ্ঘন করা যায় না তেমনি বাধা গুলি এসে সামনে দাঁড়ায় অথচ একটি প্রান অপর প্রানের জন্য প্রাণ নিবেদনে প্রস্তুত তবুও দুটি প্রাণ এক হতে পারে না, কবে সেই শুভযুগ আসবে প্রণয়ের মনোরথে কেউ বাধা দেবে এমন একটা যুগ কবি চাইছেন।

- কবিতাটির মূলকাব্যগ্রন্থ হল 'আলো ও ছায়া' (১৮৮৯)
- কবিতাটির মোট পংক্তি সংখ্যা হল - ২০।

উল্লেখযোগ্য পংক্তি :

- কেন এত হাহাকার, এত ঝরে অশ্রু ধার ?
  কেন কণ্ঠকের কূপ প্রণয়ের পথে?
- অনুলঙ্ঘ্য বাধা রাশি সম্মুখে দাঁড়ায় আসি -
  কেন দুই দিকে আহা যায় দুই জন?
- কাঁদিবে না সারা পথে; প্রণয়ের মনোরথে
  স্বর্গমর্ত্যে কেহ নাহি দিবে বাধা দান?

দিন চলে যায়

একে একে কালের প্রবাহ পরে প্রবাহ গড়ায় দিন চলে যায়। সাগরের বুদ্বুদের মতো হৃদয়ের বাসনা হৃদয়েই মিলায়। শিথিল হৃদয় নিয়ে, নর শূন্যালয়ে গিয়ে জীবনের বোঝা মাথায় তুলে নেয়। একটু একটু করে মানুষের শোক নয়ন জলে মিশিয়ে যায়। অতীতের কাহিনী ও স্মৃতিকে স্বপ্নের মতো মনে হয়। এভাবেই দিন চলে যায়।

- 'দিন চলে যায়' কবিতাটি 'আলো ও ছায়া' কাব্য থেকে নেওয়া হয়েছে।
- কবিতায় মোট পংক্তিসংখ্যা - ১৫

উল্লেখযোগ্য পংক্তি :

- একে একে একে হায়! দিনগুলি চলে যায়,
  কালের প্রবাহ পরে প্রবাহ গড়ায়
- জীবনে আঁধার করি, কৃতান্ত সে লয় হরি
  প্রাণাধিক প্রিয়জনে, কে নিবারে তায়?
- স্মৃতি শুধু জেগে রহে অতীত কাহিনী কহে
  লাগে গত নিশীথের স্বপনের প্রায়;
  আর দিন চলে যায়!

Sub Unit – 5

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯ - ১৯৭৬)

কাজী নজরুল ইসলাম বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম - কাজী ফকির আহমেদ। ১৩২৬ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য নামক পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা 'মুক্তি' প্রকাশিত হয়। ১৯২১ খ্রীঃ 'বিজলী' পত্রিকায় 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাংলায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়। কবি তাঁর কবিতায় কেবল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নয়, সমস্ত অন্যায় অবিচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন।

তথ্য

- নজরুল ইসলাম অন্যনাম ছিল 'দুখু মিঞা'।
- নজরুল ইসলামের স্ত্রীর নাম - নার্গিস আসার খানম প্রমিলা দেবী।
- নজরুল ইসলাম যে পুরস্কার পেয়েছিলেন সেগুলি হল -
  স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৭৭)
  একুশে পদক (১৯৭৬)
  পদ্মভূষণ

- **উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী :**

অগ্নিবীণা - ১৯২২
সঞ্চিতা - ১৯২৫
ফণীমনসা - ১৯২৭
চক্রবাক - ১৯২৯
সাতভাই চম্পা - ১৯৩৩
নির্ঝর - ১৯৩৯
নতুন চাঁদ - ১৯৫১
সঞ্চয়ন - ১৯৫৫
নজরুল ইসলাম; ইসলামী কবিতা - ১৯৮২

- **নজরুল সম্পাদিত ও পরিচালিত পত্রিকা :**

i) দৈনিক নবযুগ (১৯২০ ও ১৯৪০ অক্টোবর)।
ii) ধূমকেতু (অর্ধসপ্তাহিক ১৯২২, ১১ই আগস্ট; ২৬শে শ্রাবন ১৩২৯) শুক্রবার ১ম সংখ্যা থেকে ২০শে সংখ্যা (৭ নভেম্বর ১৯২২; ২১শে কার্তিক ১৩২৯) মঙ্গলবার পর্যন্ত সম্পাদনা করেন।
iii) লাঙল - (সাপ্তাহিক - ১৯২৫; ১৬ ডিসেম্বর, ১৩৩২; ১লা পৌষ)

- **উল্লেখযোগ্য মন্তব্য :**

  - বিদ্রোহী পড়লুম ছাপার অক্ষরে মাসিক পত্রে - মনে হলো এমন কখনও পড়িনি। অসহযোগে অগ্নিদীক্ষার পরে সমস্ত মন প্রান যা কামনা করছিল এ যেন তা-ই দেশব্যাপী উদ্দীপনার এই যেন বাণী।
    [বুদ্ধদেব বসু; কালের পুতুল]
  - সেদিন ঘরের বাইরে মাঠে; ঘাটে; রাজপথে; সভায় এ কবিতা নীরবে নয়, উচ্চকণ্ঠে শত শত পাঠক পড়েছে। সে উত্তেজনা দেখে মনে হয়েছে . . . . .ছাপার অক্ষরেই যেন আগুন ধরিয়ে দেবে।
    [প্রেমেন্দ্র মিত্র; নজরুল প্রসঙ্গ নজরুল সন্ধ্যা ১৯৬৯]
  - "We do not rrrhaps realise the magnitude of the debt owed by Kazi Nazrul Islam verse to the living experience he had of Jails."
    [নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু]

- "এ দেশের নাড়ীতে নাড়ীতে অস্থি মজ্জার যে পচন ধরেছে তাতে এর একেবারে ধ্বংস না হলে নতুন জাত গড়ে উঠবে না।" [নজরুল ইসলাম; 'ধমকেতু' পত্রিকায়]

কবিতার নাম	মূলকাব্য	প্রকাশকাল	পত্রিকায় প্রকাশ	স্তবক সংখ্যা	প্রথম লাইন	শেষ লাইন
বিদ্রোহী	আগ্নিবীনা	১৩২৮	বিজলী	১৩	বল বীর বল উন্নত মম শির।	আমি বিশ্ব ছড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির উন্নত শির।
আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে	দোলন চাঁপা	১৩৩০	কল্লোল	৭	আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে।	আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে।
সর্বহারা	সর্বহারা	১৩৩২	লাঙল	৫	ব্যাথার সাতার পানিঘেরা চোরাবালির চর।	চলরে জলের যাত্রী এবার মাটির বুকে জল।
আমার কৈফিয়ৎ	সর্বহারা	১৩৩২	লাঙল	১৪	বর্তমানের কবি আমি ভাই ভবিষ্যতের নই নবী	যেন লেখায় হয় আমার রক্তে। লেখায় তাদের সর্বনাশ।
পূজারিনী	দোলন চাঁপা	১৩৩০		২৬	এত দিনে অবেলায় প্রিয়তম	তব প্রেমে মৃত্যুঞ্জয়ী ব্যথা বিষে নীলক কবি।
সব্যসাচী	ফনিমনসা	১৩৩২	লাঙল	৯	ভরে ভয় নাই আর, দুনিয়া উঠেছে হিমালয় চাপা প্রাচী!	যা হোক একটা দাও কিছু হাতে একবার মরে বাঁচি।

পূজারিণী

কবি জনম জনম ধরে চেনেন পূজারিণীকে। যিনি কবির সামনে ধূলি অন্ধ ঘূর্নীর মতো কবির সামনে এসে দাঁড়ায়। ওই রমণীর ভুরু, ললাট, চিবুক তাঁর অপরূপ রূপ তাঁর গীতি নৃত্য, তাঁর রাজহংসী ছল সবই কবির পরিচিত। কবি ছয় প্রত্যয়ী হয়ে বলেছেন চিনি প্রিয়া চিনি তোমার জন্মে জন্মে চিনি। কবির তৃষাতুর চোখে পূজারিণীকে ভালো লেগেছিল। দেশের সমস্ত দুঃখ দুঃখ-দুর্দশার রূপকে কবি পূজারিণীর উপমায় তুলে ধরেছেন।

- 'পূজারিণী' কবিতাটি দোলন চাঁপা কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত কবিতাটি প্রকাশিত হয় ১৩৩০ সালে।
- পূজারিণী কবিতাটির মোট ১০টি পর্যায়ে।
- পূজারিণী কবিতায় উল্লেখিত নারী হলেন - সীতা, রাধা, দময়ন্তী, শকুন্তলা, সতী, উমা এরা সকলেই বিরহী প্রেমিকা।

উল্লেখযোগ্য পংক্তি :

- ‘ঐ তব দোলা দোলে গতি নৃত্য দুষ্ট রাজহংসী জিনি চিনি, সব চিনি’।
- ‘আজ দিনান্তের প্রান্তে বলি আঁখি নীরে তিতি আপনার মনে আনি তারি দূর দূরান্তের স্মৃতি’-
- অনন্ত কুমারী সতী ; তব দেব পূজার থালিকা ভাঙিয়াছি যুগে যুগে, ছিঁড়িয়াছি মালা।
- রিক্তা আমি, আমি তব গরবিনী, বিজয়নী নই!
- তুমিই মোর এ বাহুতে মহাশক্তি মহাশক্তি সঞ্চারিয়া বিদ্রোহীর জয়লক্ষ্মী হবে!

সব্যসাচী

অসহযোগে আন্দোলন দেশবাসীর চিত্তে দেশের শৃঙ্খলা মুক্তির ব্যাপারে অনেক আশার সঞ্চার করেছিল। কিন্তু ইহার অবসান হওয়ার অনেকের চিত্তে হতাশা দেখা দেয়। এই অবস্থায় দেশবাসীর চিত্তে মনোবল সঞ্চারের জন্য নজরুল ‘সব্যসাচী’ কবিতাটি রচনা করেন। অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে দেশের শৃঙ্খল মুক্তির প্রয়াস ব্যর্থ হলেও এ কবিতায় কবি বলেছেন যে দেশবাসীর চিন্তার কারন নেই - কারন অর্জুনের ন্যায় মহাবীরের আবির্ভাব হতে চলেছে। দুই হস্ত দ্বারাই সমানভাবে অস্ত্র নিক্ষেপ করতে পারতেন বলে অর্জুনকে ‘সব্যসাচী’ বলা হয়।

- ‘সব্যসাচী’ কবিতাটি ‘লাঙল’ পত্রিকায় ১৯২৬; ৭ জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয়।
- ‘সব্যসাচী’ কবিতায় রামায়নের যে চরিত্রগুলির উল্লেখ রয়েছে সেই চরিত্রগুলি হল - সীতা, রাবন, প্রজাপতি।
- ‘সব্যসাচী’ কবিতায় মহাভারতের যে চরিত্রগুলির উল্লেখ আছে সেগুলি হল - পার্থ, শ্রীকৃষ্ণ, দুর্যোধন, দুঃশাসন, কংস, নৃসিংহ, দধীচি।
- ‘সব্যসাচী’ কবিতার স্তবক সংখ্যা -৯টি লাইন সংখ্যা - ৫৪টি।

উল্লেখযোগ্য পুংক্তি :

- বিরাট্ কালের অজ্ঞাতবাস ভেদিয়া পার্থ জাগে।
- যুগে যুগে মরে বাঁচে পুনঃ পাপ দুর্মতি কুরুসেন।
- কালের চক্র বক্র গতিতে ঘুরিতেছে অবিরত।
- কংস কারায় কংস, হন্তা জন্মিছে অনাগত।
- যুগে যুগে হন শ্রীভগবান যে তাঁহারি রথ - সারথি!
- বাঁচিতে বাঁচিতে প্রায় মরিয়াছি এবার সব্যসাচী, যা হোক একটা দাও কিছু হাতে একবার মরে বাঁচি।

আমার কৈফিয়ৎ

কবি বলছেন তিনি বর্তমানের কবি, ভবিষ্যতের সুখকামনার চেয়ে কঠিন বাস্তবটাই সত্য কবির কাছে। কবি সকলের কাছে মূল্যহীন, উপহারের পাত্র। মৌলবী মোল্লারা তাদের দেবীনাম মুখে আনলে দূর করে দেয় কবি নিজেকে বুঝতে পারেননা। তিনি নিজে কি তিনি হিন্দুদের কাছে তাচ্ছিল্য হন আবার মুসলিমদের দ্বারা বিতাড়িত হন, হিন্দুরা ভাবেন কবি ‘ফার্সী’ শব্দে কবিতা লেখেন, কেউ ভাবে কবি বিপ্লবী, আবার কেউ ভাবে কবির বাণী অহিংসা, কবি বুঝতে পারছেন না তিনি কি লিখছেন তবুও তিনি বলেছেন শুধাতুর শিশু স্বরাজ চায়না সে দুটো ভাত আর একটু নুন চায়। কবি অন্যায় অত্যাচার সহ্য করতে পারেন না। তাই যারা তেত্রিশ কোটির মুখের গ্রাস কেড়ে খায় তাদের সর্বনাশ করতে চায় লেখার মাধ্যমে।

- কবিতাটি কবির ‘সর্বহারা’ কাব্যের অন্তর্গত।
- ‘আমার কৈফিয়ৎ’ কবিতাটি ১৩৩২ আশ্বিন ‘বিজলী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
- কবিতাটির মোট স্তবক সংখ্যা - ১৪টি এবং লাইন সংখ্যা - ৮৪টি।
- কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উল্লেখ রয়েছে, এছাড়াও - শনিবারের চিঠির উল্লেখ রয়েছে।

উল্লেখযোগ্য পংক্তি :

- বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই নবী !
- প্রতি শনিবারী চিঠিতে প্রেয়সী গালি দেন তুই হাঁড়িচাচা !
- মাতা কয়, ওরে চুপ হতভাগা স্বরাজ আসে যে দেখ চেয়ে !
- অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু যাহারা আছ সুখে !
- প্রার্থনা করো - যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস যেন লেখা হয় আমার রক্ত লেখায় তাদের সর্বনাশ !

সর্বহারা

ব্যথার চোরাবালির পরে কে যেন ঘর বেঁধেছে। শূন্যে তড়িৎ ইশারা আর মেঘ জননী অশ্রুধারা ঝরতে থাকে। বন্যাকে যেন সাগর মা ডাকছে, মায়ের কোলে আর সেই সঙ্গে নায়ের মাঝিকে পাল তুলে দিতে বলে, মায়ার নোঙর তোলা বন্ধ করো, কবি মাঝিকে বলছেন তোর নাও ভাসিয়ে মাটির বুকে চলতে, বলেছেন প্রলয় পথিক হিসেবে চলবি, পাহাড় গিরি দলে চলে যাবি সেই মাটির বুকে।

- 'সর্বহারা' কবিতাটি কবি নিজের মাকে উৎসর্গ করেছেন।
- 'সর্বহারা' কবিতাটি স্বরবৃও ছন্দের ব্যবহার করেছেন কবি।
- কবিতায় পংক্তি সংখ্যা - ৫০টি এবং স্তবক সংখ্যা - ৫টি।

উল্লেখযোগ্য পুংক্তি :

- ওরে পাগল! কে বেঁধেছিস্
  সেই চরে তোর ঘর?
- 'শূন্য তড়িৎ দেয় ইশারা
  . . . .
  মেঘ জননীর অশ্রুধার . . ।'
- ঐ কাঁদনের বাঁধন ছেঁড়া
  এতই কি রে দায়?
- প্রলয় - পথিক চল্‌বি ফিরি
  দল্‌বি পাহাড় কানন গিরি!
- হাঁক্‌ছে বাদল, ঘিরি ঘিরি
  নাচছে সিন্ধুল
  চল্‌রে জলের যাত্রী এবার
  মাটির বুকে চল।।

teachinns Text with Technology

আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে

আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মন প্রাণ খুশিতে মেতে আছে কবির রুদ্ধ প্রান বৈউহল হয়ে ছুটে বেড়াতে চাইছে। তিক্ত ভরা বুকে দুঃখের জন্য নয় সুখের জন্য ভরে ওঠে। আর সেই খুশিতে সাগর ফুলছে, আকাশ দুলছে ও বাতাস ফুলছে, ধুমকেতু আর উল্কা সৃষ্টিকে উল্টে দিতে চায়, সাগর জেগে উঠতে চায়, মরু হাসছে সব মিলিয়ে সকলে সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মেতে উঠতে চায়।

- 'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' কবিতাটি 'দোলন চাঁপা' (১৩৩০) কাব্যের অন্তর্গত।
- 'আজ' শব্দটি ১৬ বার ব্যবহৃত হয়েছে।
- কবিতাটিতে ৭টি স্তবক আছে। এবং ৪টি পুংক্তি আছে।
- 'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' কথাটি ৯ বার আছে।
- এই কবিতাটি সৈয়দ সাজাদ হোসেন 'The Eastasy of creation' নামে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন।

উল্লেখযোগ্য পংক্তি :

- ফুললো সাগর দুললো আকাশ ছুটলো বাতাস
  গগন ফেটে চক্র ছোটে; পিনাক পাণির শূল আসে!
- পলাশ অশোক শিমুল ঘায়েল
  ফাগ লাগে ঐ দিক্ বাপে।
- আজ আসল উষা, সন্ধ্যা, দুপুর,
  আস্‌ল নিকট আস্‌ল সূদূর।
- আজ জাগ্‌ল সাগর, হাসল মরু
  কাঁপল ভূধর, কানন - তরু

বিদ্রোহী

শির উন্নত করে বীরের মত বাঁচার অঙ্গীকার। সমস্ত বাধা বিপদকে জয় করার সাধনা। দুর্বারের মত সমস্ত কিছু কে ভেঙে ফেলার আকাঙ্খা। শত্রুর সাথে পাঞ্জা ধরে উদ্মাদের মত সব কিছুকে জয় করা। কবি নিজেকে বলেছেন - ভরাতরী, ভরাডুবি, টপেডো, ভীম, ধূর্জটি, এলোকেশী, বৈশাখী, ঝঞ্ঝা, ঘূর্ণি, হাম্বীর ছায়ানট, মহামারী, যজ্ঞ, পুরোহিত, অগ্নি, সৃষ্টি, ধ্বংস, লোকালয়, শ্মশান প্রভৃতির সঙ্গে তুলনা করেছে। এই চির বিদ্রোহী বীর বিশ্ব ছাড়িয়ে একা উন্নত শিরে দাড়িয়ে রয়েছে।

- বিদ্রোহী কবিতাটি 'অগ্নি বীনা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।
- কাজী নজরুল ইসলাম মেটকাফ প্রেস, ৭৯ বলরাম দে স্ট্রীট কলকাতায় প্রথম 'বিদ্রোহী' কবিতাটি মুদ্রণ হয়।
- সপ্তাহিক 'বিজলী' পত্রিকায় সর্বপ্রথম বিদ্রোহী কবিতাটি প্রকাশিত হয়। প্রকাশকাল ১৩২৮, ২২ পৌষ শুক্রবার।

উল্লেখযোগ্য পংক্তি :

- আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ব-বিধাত্রীর!
- আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস; আমি লোকালয়, আমি শ্মশান!
- আমি মানব দানব দেব তার ভয়, বিশ্বের আমি বির দুর্জয়!
- আমি বিদ্রোহী ভৃত্ত, ভগবান বুকে, এঁকে দেবো পদ চিহ্ন!
- আমি চির বিদ্রোহী বীর -
  আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির উন্নত শির!

teachinns Text with Technology

Sub Unit – 6

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯ - ১৯৫৪)

জীবনানন্দের জন্ম ১৮৯৯ খ্রীঃ ২৩ জানুয়ারি বাংলাদেশের বরিশাল শহরে। বাবার নাম - সর্বানন্দ দাশ; মা সেকালের বিখ্যাত কবি - কুসুম কুমারী দাশ। জীবনানন্দের প্রথম মুদ্রিত কবিতা 'বর্ষা আবাহন' সত্যানন্দ সম্পাদিত 'ব্রহ্মবাদী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'প্রগতি', 'পরিচয়', 'কবিতা', চতুরঙ্গ ও পূর্বাশা প্রভৃতি সেকালের নানা উল্লেখযোগ্য পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালক' প্রকাশিত হয় ১৯২৭ খ্রীঃ।

তথ্য

- জীবনানন্দ দাশ শ্রীকালপুরুষ ছন্দ নামে কবিতা লিখতেন।
- কবির মোট কবিতা সংখ্যা - ৩৫২টি।
- গদ্য ছন্দ কবিতা লিখেছেন - ২৪টি।
- অক্ষরবৃত্ত ছন্দে লেখা - ২৭৫টি।
- মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা কবিতা - ১৬টি।
- স্বরবৃত্ত ছন্দে লেখা কবিতা - ৩৭টি।
- জীবনানন্দের ডাক নাম 'মিলু'।

উল্লেখযোগ্য মন্তব্য :

- "জীবনানন্দবাবু বাংলাকাব্য সাহিত্যে একটি অজ্ঞাতপূর্ব - ধারা আবিষ্কার করেছেন বলে আমার মনে হয়।" [বুদ্ধদেব বসু]
- 'জীবনানন্দকে বাদ দিয়ে ১৯৩০ পরবর্তী বাংলা কাব্যের কোনো সম্পূর্ণ আলোচনাই হতে পারে না'। [বুদ্ধদেব বসু]
- "তোমার কবিত্বশক্তি আছে তাতে সন্দেহমাত্রা নেই। কিন্তু ভাষা প্রভুতি নিয়ে এত জবরদস্তি কর কেন বুঝতে পারিনে।" [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]
- "রোম্যান্টিক কবিদের অধরা সৌন্দর্যের পিয়াসী তিনি নন। পার্থিব জীবনের সমস্ত অসম্পূর্ণতা ও কুশ্রীতা তাঁর কাব্যে প্রতিফলিত হবে।" [দীপ্তি ত্রিপাঠী]
- তোমার কবিতাগুলি পড়ে খুশি হয়েছি। তোমার লেখায় রস আছে, স্বকীয়তা আছে এবং তাকিয়ে দেখার আনন্দ আছে। [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

কবিতার নাম	কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশকাল	পত্রিকায় প্রকাশ	প্রথম লাইন	শেষ লাইন
বোধ	ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬)	প্রগতি (১৩৩৬)	আলো অন্ধকারে যাই মাথার ভেরতে স্বপ্ন নয়	সে সব হৃদয়ে ফলিয়াছে সেই সব
হায়চিল	বনলতা সেন (১৯৪২)	কবিতা (১৩৪২)	হায় চিল শোন দিন ডানার চিল এই। ভিজে মেঘের দুপুরে (এটি দুবার ব্যবহৃত হয়েছে)	তুমি আর উড়ে উড়ে কেঁদো নাকো ধানসিড়ি নদীর পাশে

সিন্ধুসারস	মহাপৃথিবী (১৯৪৪)	কবিতা (১৩৪৩)	দুএক মুহূর্তে শুধু রৌদ্রের সিন্ধুর কোলে তুমি আর আমি হে সিন্ধুসারস	কলরব করে উড়ে যায় উড়ে যায় শত সিন্ধ সূর্য সূর্য ওরা শাশ্বত সূর্যের তীব্রতার
শিকার	বনলতা সেন (১৯৪২)	কবিতা (১৩৪২)	ভোর; আকাশের রং ঘাসফড়িংয়ের দেহের মত কোমল নীল।	এলোমেলোর কয়েকটা বন্দুক হিম- নিস্পন্দ নিরপরাধ ঘুম।
গোধূলি সন্ধ্যার নৃত্য	সাতটি তারারতিমির (১৯৪৮)	পরিচয়	দরদালানের ভিড়-পৃথিবীর শেষে	পায়ের ভঙ্গির নিচে বৃশ্চিক-কর্কট-তুলা-মীন।
রাত্রি	সাতটি তারার তিমির (১৯৪৮)	কবিতা	হাইড্রান্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল;	বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবসত

বোধ

কবি নিজের বোধকে এড়াতে পারছেন না, এইবোধ স্বপ্নের নয়, শান্তির নয়, ভালোবাসারও নয় এই বোধের জন্ম হৃদয় থেকে কবির কাছে সমস্ত কাজ তুচ্ছ মনে হয় পন্ড মনে হয়, কবি সহজ ভাবে লোকের সঙ্গে মিশে সহজ কথা বলে মাটির গন্ধ মেখে, চাষার মতো জীবন কাটিয়ে ও কবির বোধে নিবৃত্তি হয়নি। কবি সকল লোকের মাঝে থেকে নিজেকে নিসঙ্গ মনে করছেন।

- জীবনানন্দের 'বোধ' কবিতাটি বুদ্ধদেব বসুকে, কাপড়ে বাঁধই জ্যাকেট সংবলিত।
- 'ধূসর পান্ডুলিপি'র প্রথম সংস্করনের কবিতা সূচিতে ৭ নম্বরে 'বোধ' কবিতাটি ছিল।
- 'বোধ' কবিতাটি ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে প্রগতি পত্রিকায় ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।
- 'বোধ' কবিতাটি ধূসর পান্ডুলিপির প্রথম সংস্করনে কবিতা সূচিত ৭ নম্বরে।
- 'বোধ' কবিতাটিকে সামনে রেখে 'শনিবারের চিঠি'র সংবাদ সাহিত্য' বিভাগে (আশ্বিন, ১৩৩৬) প্রকাশিত।
- 'বোধ' কবিতাটির চরন সংখ্যা - ১০৮ এবং স্তবক সংখ্যা -১০৮।

উল্লেখযোগ্য পংক্তি :

- 'স্বপ্ন নয়, কোন এক বোধ কাজ করে;'
- 'আমার নিজের মুদ্রাদোষে
  আমি একা হতেছি আলাদা'?
- 'সন্তানের জন্ম দিতে দিতে
  যাহাদের কেটে গেছে অনেক সময়'
- 'নষ্ট শসা - পচা চালকুমড়ার ছাঁচে,
  যে-সব হৃদয়ে ফলিয়াছে / - সেই সব'।

হায়চিল

কবি চিলকে ধানসিঁড়ি নদীর পাশে সোনালী ডানা মেলে উড়তে মানা করছেন। চিলের কান্না কবিকে বিষাদ করে তুলেছে কবিকে অতীতের কিছু স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যা কবিকে বেদনায় ভারাক্রান্ত করছে কবি অতীতের ভুলে যাওয়া স্মৃতি ডেকে আনতে না বলছেন চিলকে। কবিকে কেঁদে কেঁদে উড়তে নিষেধ করেছেন।

- জীবনানন্দ দাশ এর 'হায়চিল' কবিতাটি 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। কবিতাটি প্রকাশিত হয় ১৩৪৯ অগ্রহায়ন।
- ইয়েটসের 'He reproves the curlew' এর সঙ্গে সাদৃশ্য আছে।

- কবিতায় মোট লাইন সংখ্যা ৭টি।
- হায়চিল কবিতায় 'বেতের ফল' ও ধানসিঁড়ি নদীর উল্লেখ রয়েছে।

উল্লেখযোগ্য পুংক্তি :

- 'হায় চিল সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
  তুমি আর কেঁদোনাকো উড়ে উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে!'
- পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে।
- 'আবার তাহারে কেন ডেকে আনো ? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে!'

সিন্ধুসারস

কবি সিন্ধু সারসকে বলছেন রৌদ্রের সিন্ধু কোলে তুমি আর আমি ঐক সিন্ধুর হিল্লোলে পাহাড়ের কোলে তরঙ্গ বরফের মতো সাদা, ধবলের মতো ফেনায় নাচ যেন পৃথিবীকে আনন্দ দিতে চায়। কবি অতিতের স্মৃতি চারণ করছেন ইচ্ছা, চিন্তা, স্বপ্ন, ব্যথা, ভবিষৎ, বর্তমান সব কিছু মিশিয়ে আনন্দের গতি হারিয়ে যাচ্ছে।

- কবিতাটি 'মহাপৃথিবী' কাব্যের অন্তর্গত।
- সিন্ধুসারস কবিতায় মোট স্তবক সংখ্যা - ১০টি এবং পুংক্তি সংখ্যা - ৫০টি।
- সিন্ধুসারস কবিতাগুলো ১৩৩৬ - ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের মধ্যে রচিত।
- 'সিন্ধুসারস' কবিতায় শেলির 'To the skylark' কবিতার প্রভাব আছে।
- 'সিন্ধুসারস' কবিতাটিতে 'মালাবার পাহাড়', 'মাছি', 'সোনালি চিল', 'ধানসিড়ি নদী', বিদিশা, হেমেন্তের কুয়াশা, 'হেলিওট্রোপ', প্রভৃতি প্রসঙ্গ রয়েছে।

উল্লেখযোগ্য পংক্তি :

- 'মুছে যায় পাহাড়ের শিঙে-শিঙে গৃধিনীর অন্ধকার গান',
- জানো কি অনেক যুগ চলে গেছে? মরে গেছে অনেক নৃপতি?
- 'জানি পাখি, শাদা পাখি, মালাবার ফেনার সন্তান'।
- 'রূপসীর সাথে এক; সন্ধ্যার নদীর ঢেউয়ে আসন্ন গল্পের মতো রেখা'
- 'মেঘের দুপুর ভাসে - সোনালি চিলের বুক হয় উন্মন'
- হেমন্তের কুয়াশায় ফুরাতেছে অল্পপ্রাণ দিনের মতন।

শিকার

কবি প্রকৃতির একটি সুন্দর ছবি এঁকেছেন আকাশের বং ঘাসফড়িঙের দেহের কোমলতা, সেই সঙ্গে পাড়াগাঁর বাসর ঘরে গোধূলি মদির মেয়েটির মতো; সূর্যের আলোয় প্রকৃতি ময়ূরের নীল ডানার মত ঝিলমিল করছে। সারারাত চিতাবাঘিনীর হাত থেকে পালিয়ে বাঁচা হরিন শরীরকে আবেশ দেওয়ার জন্য নদীর জলে নামে আর সেসময় সৌখিন টেরিকাটা মানুষেরা তাদের লীলসা চরিতার্থ করতে তাকে গুলিবিদ্ধ করে। দ্বিতীয়বার আগুন জ্বেলে উষ্ম লাল হরিনের মাংসের ইঙ্গিত করেছেন।

- জীবনানন্দ দাশ এর শিকার কবিতাটি বনলতা সেন কাব্য গ্রন্থের অন্তর্গত।
- এই কবিতাটি 'কবিতা' পত্রিকায় ১৩৪৩ এর আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।
- শিকরে কবিতার মোট স্তবক সংখ্যা হল - ৪টি এবং মোট পংক্তি সংখ্যা হল - ৩৪টি।
- 'শিকার' কবিতার মিল পাওয়া যায় চেকভের "A Dreary story' কবিতায়।
- 'শিকার' কবিতায় ঘাসফড়িং, টিয়ার পালক, মোরগ ফুল, উপমা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য পংক্তি :

- 'পাড়াগাঁর বাসরঘরে সবচেয়ে গোধুলি মদির মেয়েটির মতো;'
- 'শুকনো অশ্বত্থপাতা দুমড়ে এখনও আগুন জ্বলছে তাদের;'

- ‘সারারাত চিতাবাঘিনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে-বাঁচিয়ে
  নক্ষত্রহীন, মেহগনির মতো অন্ধকারে সুন্দরীর বন থেকে অর্জুনের বন ঘুরে ঘুরে’
- ‘নক্ষত্রের নিচে ঘাসের বিছানায় বসে অনেক পুরোনো শিশিরভেজা গল্প’
- ‘এলোমেলো কয়েকটা বন্দুক - হিম - নিস্পন্দ নিরপরাধ ঘুম’।

গোধুলিসন্ধির নৃত্য

পৃথিবীতে দরদালানের ভিড় আর নেই, শব্দহীন, সমস্ত কিছু খন্ড খন্ড হয়ে গেছে। কেবলমাত্র উঁচু উঁচু হরীতকী গাছের পিছনে হেমন্তের বিকেল আর সূর্যের গোলা যেটা রাঙা হয়ে আছে। . . .সূর্যাস্তের পর জোস্নার সমাগম ঘটে যেখানে পেঁচাকেই শুধু দেখা যায়। যেখানে সূর্যকে কিছুক্ষণ আগে রাঙা মনে হচ্ছিল পরে সেটি রুপার ডিবের মতো বিখ্যাত মুখ দেখা যাচ্ছে। প্রকৃতির বর্ণনার প্রসঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে অতীতের বিজয়ী নারীর প্রসঙ্গে এসেছে, বিদেশী পুরুষদের আমাদের দেশে যুদ্ধ, বাণিজ্য করার প্রসঙ্গ এসেছে।

- ‘গোধুলিসন্ধির নৃত্য’ কবিতাটি ‘সাতটি তারার তিমির’ কাব্যের অন্তর্গত।
- ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে চৈত্র সংখ্যায় ‘গোধূলি সন্ধির নৃত্য’ কবিতাটি প্রকাশ পায়।
- কবি জীবনানন্দ দাশ কবিতাটি বন্ধু হুমায়ুন কবীর কে উৎসর্গ করেছেন।
- কবিতায় ‘হেমন্ত’ ঋতুর প্রসঙ্গ রয়েছে। হংকং, সাংহাই, বিদেশের কথার উল্লেখ আছে। বৃশ্চিক, কর্কট, তুলা, মীন প্রভৃতি রাশির কথা উল্লেখ আছে।

উল্লেখযোগ্য পংক্তি :

- ‘হেমন্তের বিকেলে সূর্য-গোল-রাঙা -’
- ‘বাদামী পাতার ঘ্রান-মধুকূপী ঘাস’।
- ‘খোপার ভেতরে চুলে নরকের নবজাত মেঘ’।
- ‘যুদ্ধ আর বানিজ্যের বেলোয়ারি রৌদ্রের দিন’।
- ‘পায়ের ভঙ্গির নিচে বৃশ্চিক-কর্কট-তুলা-মীন’।

teachinns Text with technology

রাত্রি

হাইড্রেন্ট খুলে দিলে কুষ্ঠরোগী সেই জল চেটে নেয়। রাস্তায় যানবাহনের শব্দ। কবি মাইল মাইল পথ হেঁটে বেন্টিক স্ট্রিটে টেরিবাজারে গিয়ে দাঁড়ান। সেই সঙ্গে স্মৃতি চারন করেন অতীতে মৈত্রেয়ী বানী আর্থাৎ শ্লোক আর রাজ্যজয়ের ইতিহাস অমর আত্তিলা কবির মনের মধ্যে পৃথিবীর প্রতি একটা টান অনুভব করে। ফিরিঙ্গি যুবক চলে যায় লোল নিগ্রো হাসে। নগরীর মহৎ রাত্রিকে কবি লিবিয়ার জঙ্গলের মতো মনে করেছেন। তবুও জন্তু গুলো অনুপূর্ব বসত কাপড় পরে নিজেদের লজ্জা নিবারনের জন্য।

- ‘রাত্রি’ কবিতাটি জীবনানন্দদাশের ‘সাতটি তারার তিমির’ কাব্যের অন্তর্গত।
- ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে ‘রাত্রি’ কবিতাটি ‘কবিতা’ পত্রিকায় পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।
- ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে পৌষ সংখ্যায় ‘রাত্রি’ কবিতাটি ‘নিরুক্ত’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
- এলিয়েটের ‘Sweeny Erect’ কবিতার প্রভাব জীবনানন্দের রাত্রি কবিতার সঙ্গে মিল রয়েছে।
- ‘রাত্রিকবিতায় যে রাস্তার কথা উল্লেখ আছে তা হল - ফিয়ার লেন, বেন্টিক্ স্ট্রিট, টেরিটি বাজার।
- কবিতায় ‘মৈত্রেয়ী’, ইহুদি রমণী’, ‘ফিরিঙ্গি যুবক’, ‘লোল নিগ্রো’, উল্লেখ রয়েছে।
- কবিতায় ‘মায়াবীর জাদু’, ‘চীনাবাদাম’, ধনুকের ছিলা লিবিয়ার জঙ্গলের প্রসঙ্গ আছে।
- ‘রাত্রি’ কবিতায় ‘কুষ্ঠরোগীর’ প্রসঙ্গ রয়েছে।
- এই কবিতায় রিকশ, ডাইনামো, গরিলার প্রসঙ্গ আছে।

উল্লেখযোগ্য পংক্তি :

- ‘হাইড্র্যান্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল;’
- ‘তিনটি রিক্শ ছুটে মিশে গেল শেষ গ্যাসল্যাম্পে মায়াবীর মতো জাদুবলে’।

- ‘দাঁড়ালাম বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে গিয়ে - টেরিটিবাজারে;’
- ‘ডাইনামোর গুঞ্জনের সাথে মিশে গিয়ে
  ধনুকের ছিলা রাখে টান’।
- “শ্লোক আওড়ায়ে গেছে মৈত্রেয়ী কবে;
  রাজ্য জয় করে গেছে অমর আত্তিলা।”
- ‘নাগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয় লিবিয়ার জঙ্গলের মতো’।

teachinns Text with Technology

Sub Unit - 7
বিষ্ণু দে (১৯০৯ - ১৯৮২)

বিষ্ণু দে ১৯০৯ খ্রিঃ কলকাতার বিখ্যাত শ্যামাচরণ দে এর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের কৃতী ছাত্র বিষ্ণু দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উর্বশী ও আর্টেমিস' ১৯৩১ খ্রিঃ প্রকাশিত হয়। ১৯৮২ খ্রিঃ তিনি পরলোক গমন করেন। ১৯৩৫ খ্রিঃ সুরেন্দ্রনাথ কলেজে অধ্যাপনার কাজে যুক্ত ছিলেন।

তথ্য

- ফরাসি লেখক ভেরকরের "La Silence de la Mar' এর অনুবাদ করেছেন 'সমুদ্রের মৌন' নামে।
- 'সন্দেশ' পত্রিকায় পদ্য লেখার প্রতিযোগিতা উপলক্ষে লেখা শুরু দশবছর বয়সে।

❖ উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ ঃ

চোরাবালি (১৯৩৬), পূর্বলেখ (১৯৪১) , সন্দীপের চর (১৯৪৭), অন্বিষ্ট (১৯৫০), নাম রেখেছি কোমলগান্ধার (১৯৫০), স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ (১৯৬০), সেই অন্ধকার চাই (১৯৬৬), সহিত্যের দেশ বিদেশ (১৯৬২), এলিঅটের কবিতা (১৯৫৩), হে বিদেশী ফুল (১৯৫৩), আঠারোটি কবিতা (১৯৫৮)

❖ উল্লেখযোগ্য মন্তব্য ঃ

- ''চোরাবালি আর ঘোড়সওয়ার শুধু রিরংসার রূপক নয়, তাদের উপর পুরুষ-ভক্ত-ভগবানের সম্বন্ধারোপ।''
  [চোরাবালি; সুধীন্দ্রনাথ দত্ত]
- ''৫ আথবা ৬ জানুয়ারি সারারাত রিউম্যাটিক জ্বরে আক্রান্ত অবস্থায় এ কবিতাটি রচনা করেন ; . . . তারপর ঘুম থেকে উঠে কবিতাটির দ্বিতীয় অংশ রচিত হয়।''
  [প্রভাত কুমার দাস]
- ""His poetic character is seen in the way he is constantly revising his work, rearranging earlier verses so as to give them an import not intended at the time of composition, joining fragments and occasional pieces in a wider significance."
  [An Acre of grass: বুদ্ধদেব বসু]
- 'ধ্বনিপ্রধান বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দেই বিষ্ণুদের প্রতিভা সমধিক।' [দীপ্তি ত্রিপাঠী ; আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়]
- কাব্য হিসেবে এর গুণপনা আছে কিন্তু শ্রাব্য হিসেবে এটা আমার কাছে বহুদূর বর্জনীয়। [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

কবিতা	কাব্য ও প্রকাশকাল	প্রথম লাইন	শেষ লাইন
ঘোড়সওয়ার	চোরাবালি (১৯৩৭)	'জনসমুদ্রে জেগেছে জোয়ার হৃদয় আমার চড়া।'	অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গিকার
প্রাকৃত কবিতা	স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত (১৯৬৩)	'রাসি, তোর কথা বেঁধে রাখ তোর খোঁপায়।'	'আমার কথায় একন যে দেখি মাসি তুই অস্থির।'
স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত	স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত (১৯৬৩)	'তোমার নবীন এ উদাস বিষাদ কি তোমাদেরও চেনা?'	'প্রাণ চায় চায় বরাভয় তারাই যে বর কনে।'
দামিনী	স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত (১৯৬৩)	'সেদিন সমুদ্র ফুলে ফুলে উন্মুখর মাঘী পূর্ণিমায়'	'দামিনী সমুদ্রে দীপ্র তোমার শরীরে।'
জল দাও	অন্বিষ্ট (১৯৫০)	ফাল্গুন আরম্ভে তার	জল দাও আমার শিকড়ে
২৫শে বৈশাখ	নাম রেখেছি কোমলগান্ধার (১৯৫৩)	'আমরা যে গান শুনি , গান করি, আকাশ হাওয়ায়'	'সাগরে যে গঙ্গা আনি সে তোমারই আনন্দভৈরবী'
গান	তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ (১৯৫৮)	ওরকম আমার ঘটেছে	'প্রাণ চাই, গান চাই শেয়ালদার বাস্তুহারা শেভে।'

ঘোড়সওয়ার

কবি 'ঘোড়সওয়ার' কবিতায় ঘোড়সওয়ারকে প্রতিকী হিসেবে দেখেছেন যেমন - বিপ্লবী বীর, স্রষ্ঠা; উৎপাদনকারী সবল সক্ষম প্রেমিক; পৌরুষ; গতিশীল; পথ নির্দেশনার নেতা। ঘোড়সওয়ার কবিমানসে সৃষ্ট চরিত্র। যা কবির অন্তরের অন্তস্থলের থেকে উৎপত্তি, অর্থাৎ কবির অন্তরেই রয়েছে আহ্বানকারী নারীসত্তা এবং আহুত পুরুষ ঘোড়সওয়ার। জনসমুদ্রের জোয়ারে জেগেছে ; বিশ্ববিজয়ী বর্ষাতোলে, সাগর উদ্বেল; কামনার টানে গ্লেসিয়ার সংহত হয় এবং মেরুচূড়া জনহীন হওয়ার ফলে লোকের নিন্দার ভয় তাই প্রিয়তমকে প্রশ্ন করেছেন কবি অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গিকার কোথায় পুরস্কার?

- বিষ্ণু দের ঘোড়সওয়ার কবিতাটি 'চোরাবালি' কাব্যের অন্তর্গত।
- কবিতাটি উৎসর্গ করেছিলেন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষকে।
- 'ঘোড়সওয়ার' কবিতাটির দুটি অংশ। কবিতাটির মোট স্তবক সংখ্যা ১০, প্রথম অংশে ৫টি স্তবক, দ্বিতীয় অংশে ৫টি স্তবক।
- কবিতাটিতে প্রথম অংশের পংক্তি সংখ্যা ২৩টি দ্বিতীয় অংশে পংক্তি সংখ্যা ২৬টি, মোট পংক্তি সংখ্যা ২৯টি।
- 'বিষ্ণুদের 'ঘোড়সওয়ার' কবিতাটির অনুবাদ করেন মার্টিন ক্লার্কম্যান। তিনি এই কবিতাটিকে 'পিপলস পোয়েট্রি' বা জনগণের কবিতা বলে উল্লেখ করেছেন।
- কবিতাটির মুখবন্ধ রচনা করেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এটি চোরাবালি কাব্যের ২১ নং কবিতা।
- 'ঘোড়সওয়ার' কবিতার ২য় স্তবকে 'চাঁচর' শব্দটি অর্থ কোঁকড়ানো বা কুঞ্চিত। কিন্তু মার্টিন ক্লার্কম্যান চাঁচর শব্দটির অর্থ না বুঝে অনুবাদ করেছিলেন - ''Sand smooth under the endless moon''
- ''১৯৩৫ খ্রিঃ জানুয়ারি মাসে চার বা পাঁচ তারিখের এক রাত্রি শেষে রচিত হয়েছিল এই কবিতার প্রথমাংশ।

[সুমিতা চক্রবর্তী; কবিতার অন্তরঙ্গপাঠ]

❖ উল্লেখযোগ্য পংক্তি ঃ

- 'চোরাবালি আমি দূরদিগন্তে ডাকি-
  কোথায় ঘোড়সওয়ার?'
- 'জনসমুদ্রে উন্মথি কোলাহল
  ললাটে তিলক টানো'
- 'পাহাড় এখানে হালকা হাওয়ায় বোনে
  হিমাশিলাপাত ঝঞ্ঝার আশা মনে।'
- 'জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার -
  মেরুচূড়া জনহীন -'
- ''হে প্রিয় আমার; প্রিয়তম মোর,
  আয়োজন কাঁপে কামনার ঘোর।
  কোথায় পুরষুকার?''

প্রাকৃত কবিতা

কবি 'মাসি' সম্বোন্ধন করে বলেছেন আমার কালো কম্বলই ভালো। যে কম্বপেটার রং পাকা, তুই বৃথা বকিস আর আমচুর খাস। তার পরেই কবি বলেছেন কষ্ঠিপাথরে প্রেমকে যাচাই করতে চেয়েছেন তার চোখের একটি সন্ধ্যাতারার মধ্যে। আবার কবি বিয়ে করার অঙ্গিকার করেছেন শহরের কাজ সেরে তিনি ফিরে আসবেন। প্রেমিককে নিজের হাতে ভালো করে খাওয়াতে চেয়েছেন।

- 'প্রাকৃত কবিতা' কবিতাটি 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' কাব্যের অর্ন্তগত। প্রকাশ কাল ১৩৭০ বঙ্গাব্দ।
- কবিতাটি কবি উৎসর্গ করেছিলেন শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়কে।
- 'প্রাকৃত কবিতা'র রচনার তারিখ - ৩০/০১/১৯৫৯
- 'প্রাকৃত কবিতা'র মোট স্তবক সংখ্যা - ১০
- প্রথম ৯টি স্তবকে ৩টি লাইন, ১০ স্তবকে ২টি লাইন এবং ১টি লাইন সন্নিবেশিত হয়েছে। মোট লাইন সংখ্যা ২৭টি।
- 'প্রকৃতপৈঙ্গল' সংকলন থেকে গৃহীত উপাদানে ও সমান্তরাল কাব্য ভাবনায় কবিতাটি রূপ পেয়েছে।

❖ **উল্লেখযোগ্য পংক্তি ঃ**

- ‘আমার ও কালো কম্বলই ভালো,’
- ‘কষ্ঠিপাথরে যাচাই করেছি প্রেম;’
- ‘সে যবে আসবে শহরের কাজ সেরে
  তাকেই করব বিয়ে।’
- ‘দেখব অবাক চোখে,
  খাবেন পুণ্যজন’
- ‘আমার কথায় এখন যে দেখি মাসি তুই অস্থির।’

স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত

প্রবাসে থেকে স্বদেশের স্মৃতি ভেসে ওঠে কবির মনে। এই কবিতায় মূল বিষয় কবির স্বদেশের স্মৃতি, কবির অস্তিত্ব এবং বর্তমান প্রজন্মের ভবিষ্যতের কথা । নাৎসিদের দুঃস্বপ্ন আর ইংল্যান্ডের স্বায়ত্তশাসনের কথাও আছে।

- ‘স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত’ কবিতাটি সাহিত্যপত্রে ১৩৬৬ সালে বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়।
- কবিতাটির মোট স্তবক সংখ্যা ২৩ টি
- ‘স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত’ কবিতায় সুর প্রদান করেন - জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র।
- কবিতাটিতে প্রথম ৩টি স্তবকে ৫টি করে চরণ আছে এবং দশমাত্রার পর্ব।
- কবিতায় যে জন্তুদের নাম রয়েছে - জিরাফ, টিরানোসরাস, জলহস্তী, কুমির, গোখুরা, হায়েনা, শেয়াল।
- সাহিত্য প্রসঙ্গ রয়েছে - ‘আলালের ঘরে দুলাল’
- হুতোম প্যাঁচার নকশা; বুড়ো শালিকের ঘরে বৌ।
- অষ্টম স্তবকে রয়েছে ‘ভূষন্ডী প্রান্তর’ - সালানপুরে অবস্থিত (ভুশুন্ডীর মাঠ) রাজশেখর বসু গল্প থেকে নেওয়া।

❖ **উল্লখযোগ্য পংক্তি ঃ**

- ‘আলালের দুলালের হুতোমের বুড়ো বুড়ো শালিকে কাটারায়’
- ‘জিরাফ তুলেছে যেন গলা কিংবা একটি টিরানোসরাস আশেপাশে জলহস্তী, কুমীর, গোখুরা, হায়না, শেয়াল।’
- ‘রবীন্দ্রনাথের গল্প; আশ্চর্য রূপক দিয়ে এঁকেছেন কবি আমাদের সকলের জীবনের ছবি।’
- ‘মেটেনা মেটেনা অশনায়া; / তৃষ্ণা শুধু তিক্ত পারাবারে।’

দামিনী

‘দামিনী’ কবিতাটি ‘স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত’ কাব্যগ্রন্থের আন্তর্গত, এই কবিতার মূল বিষয় দামিনীকে কেন্দ্র করে। দামিনীর আশা আকাঙ্খা না মেটা এবং দীপ্ত তেজ ব্যপ্ত হয়েছে এই কবিতায়।

- ‘স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত’ কাব্যের প্রথম প্রকাশ ১৩৭০ সালে বৈশাখ মাসে, রচনা কাল ১৯৫৫-৬১
- এই কবিতাটি রামেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্বেধি পবালিকেশসন থেকে প্রকাশিত হয়।
- শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়কে উৎসর্গ করেছেন।
- বিষ্ণুদের ‘দামিনী’ কবিতাটি ‘দেশ’ প্রত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
- ‘দামিনী’ কবিতার ৩বার এবং সমুদ্র শব্দটি ৫ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

❖ **উল্লেখযোগ্য পংক্তি ঃ**

- ‘পুনর্জন্ম চেয়েছিল জীবনের পূর্ণচন্দ্রে মৃত্যুর সীমায়’
- ‘আমার জীবনে তুমি বুঝি প্রায় প্রত্যহই ঝুলন-পূর্ণিমা’
- ‘আমারও মেটে না সাধ তোমার সমুদ্রে যেন মরি’
- ‘মাঘী বা ফাল্গুনী কিংবা বৈশাখী রাস বা কোজাগরী;’

- ‘দামিনী’ সমুদ্রে দীপ্র তোমার শরীরে।।’

জল দাও

জল দাও কবিতাটি প্রথম দুটি স্তবক আছে প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণনা। এরপর আছে দেশছাড়া উদ্বাস্তু মানুষের কথা, কুরুক্ষেত্রে ভীম এবং বৃহন্নলা অর্জুনের গানের প্রসঙ্গে নদীর মোহনার গানের কথা। আর শেষে শিকড়ে অর্থাৎ মূলে জল দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কবিতাটি ১৯৪৬ সালের গঙ্গার প্রেক্ষাপটে রচিত।

- বিষ্ণু দে’র ‘জল দাও’ কবিতাটি ‘অন্বিষ্ঠ’ (১৯৫০, সেপ্টেম্বর) কাব্যের অন্তর্গত।
- ‘জল দাও’ কবিতাটি ‘কবিতা’ পত্রিকায় ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।
- ‘কবিতাটি দানা বাঁধতে শুরু করে ১৯৪৬ এর ১৪-২৫শে আগস্ট এবং শেষ হয় ১৯৪৭ এর গ্রীষ্মে।’’
  [বিষ্ণু দে]
- ‘জল দাও’ কবিতাটিতে হপকিসের ‘Send my roots rain' এর প্রতিধ্বনি স্পষ্ট।
- বিষ্ণু দে’র কবিতাটির সঙ্গে এলুয়ার ‘You are every where’ কবিতার সাদৃশ্য দেখা যায়।
- ‘জল দাও’ কবিতাটির মোট স্তবকের সংখ্যা-২০টি। কিন্তু ২০নং স্তবকের শেষে একটি লাইন সামান্য বিরতি দিয়ে শুরু হয়েছে। কবিতায় ৫ টি দাঁড়ি (।), এবং ১টি পূর্ণদাঁড়ি (।।) আছে।
- ‘জল দাও’ কবিতাটির ৬টি পর্যায় রয়েছে।
- কবিতাটি ‘অন্বিষ্ঠ’ কাব্যের শেষ কবিতা।
- কবিতাটি যেসব ঋতুর উল্লেখ আছে - গ্রীষ্ম, বর্ষা, হেমন্ত, বসন্ত।
- মাস - বৈশাখ, আশ্বিন, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র।
- কবিতায় যে মরুভুমির উল্লেখ আছে - গোবি।
- ‘জল দাও’ কবিতাটিতে যে ফুলের উল্লেখ রয়েছে - শিমূল, পদ্ম, বেলফুল, কৃষ্ণচূড়া, লেবর্নম, আমের মুকুল, মল্লিকা।
- কবিতায় যে নদীর নাম পাওয়া যায় তা হল - যমুনা, কাঁসাই, দামোদর, রূপনারায়ন, হলদি, সাতলা, রসুলপুর, মাথাভাঙা, পদ্মা।
- কবিতাটিতে যেসব স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায় - কলকাতা, বরিশাল, ঢাকা, মধ্য এশিয়া, হাওড়া, চাটগাঁ, বাঁকুড়া, হুগলি, তুষার দেশ।
- কবিতায় যে পাখির উল্লেখ আছে - শালিক, বক, কাক।
- কবিতায় উল্লেখিত সাগর - কৃষ্ণ কাশ্যপ সাগর।
- কবিতায় উল্লেখিত মহাভারত চরিত্র - ভীম, বৃহন্নলা, ও অর্জুন।

❖ উল্লেখযোগ্য পংক্তি ঃ

- ‘ফাল্গুন আরম্ভে তার -
  এ হিসাবে অবশ্য মাঘেই’
- ‘কলকাতার কাক আর সমুদ্রের বকের বলাকা বহুদূর’
- ‘সোনালি চাঁদের এই নীল নিধিকার আলোর বন্যায়’
- ‘রূপনারায়ণের -
  দামোদর কাঁসাই হলদি রসুলপুরের --।’
- ‘পামীর আড়ালে কিংবা বুঝি কৃষ্ণ কাশ্যপ সাগরে’
- ‘মরিয়া বন্যার যুদ্ধে কখোন বা ফল্গু বা পলুলে’
- ‘‘তোমাতেই বাঁচি প্রিয়া
  তোমাতেই ঘাটের গাছে
  - - - - - - - - - -
  জলদাও আমার শিকড়ে।।’’

২৫শে বৈশাখ

২৫শে বৈশাখ কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মরন করে রচিত। রবীন্দ্রনাথের প্রতি কবির শ্রদ্ধা কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। কবি বলেছেন ছন্দের মায়ায় যে ছবি আঁকি , যে গল্প, যে হাজার হাজার কবিতা রচনা করি তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উত্তরাধিকারী হিসেবে। ফাল্গুস্রোতে লাখে লাখে হাজারে হাজারে যে রচনার সৃষ্টি হচ্ছে সে সবই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আনন্দভৈরবী হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

- বিষ্ণু দের ২৫শে বৈশাখ কবিতাটি 'নাম রেখেছি কোমলগান্ধার' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত শেষ কবিতা । রবীন্দ্রনাথের পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থের 'কোমলগান্ধার' কাব্যগ্রন্থ প্রথম বাক্যের অনুসরণে এই গ্রন্থের নাম।
- কবিতাটির মোট স্তবক সংখ্যা ৪টি, পুংক্তি সংখ্যা ২২টি।
- ২৫শে বৈশাখ কবিতায় দ্বিতীয় স্তবকে ৬টি চরণের পর একটি দাঁড়ি (।) ও শেষ স্তবকে ৪টিচরন শেষে পূর্ণ দাঁড়ি (।।) আছে।

❖ উল্লেখযোগ্য পংক্তি ঃ

- 'আমরা যে জীবনের গল্প রচি হাজার কবিতা,
  হাজার সন্ধ্যার সূর্য প্রত্যুষের হাজার সবিতা'-
- 'রবীন্দ্র ব্যবসা নয় ; উত্তরাধিকার ভেঙে-ভেঙে'
- 'রুদ্ধ উৎস খুঁজে পাই খরস্রোত নব - আনন্দের।'
- 'আষাঢ়ে শ্রাবণে আর আশ্বিনে অঘ্রানে হিম মাঘে'
- '' প্রাত্যহিক ফল্গুস্রোতে লাখে-লাখে হাজারে - হাজারে
  সাগরে যে গঙ্গা আমি সে তোমারই আনন্দভৈরবী।।''

গান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিই এই কাব্যে ভেসে উঠেছে। এই কবিতায় বলা হয়েছে গায়ক বা গায়িকা গান করার সময় নিজে সুর আর স্রোতা হয়ে যায় গানের বিষয়। আর আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের মাধুর্যের কথা।

- 'গান' কবিতাটি 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।
- 'গান' কবিতাটি ' অরান' পত্রিকায় ১৯৪২ এর ১লা মে তে প্রকাশিত হয়। ২২শে জুন গ্রন্থে 'জনযুদ্ধ' শিরোনামের ১নং কবিতাটি প্রকাশিত হয়।
- 'গান' কবিতাটিতে মালতী ঘোষাল ও দেবব্রত কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়ার প্রসঙ্গ রয়েছে।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বলাকা' (১৯১৬) কাব্যগ্রন্থের 'ছবি কবিতার সাথে 'গান' কবিতার মিল খুঁজে পাওয়া যায়।
- কবিতার স্তবক সংখ্যা ৩টি এবং মোট পুংক্তি সংখ্যা ৪৮টি
- কবিতায় যে বিষয়গুলির উল্লেখ হয়েছে - 'লালদীঘি', এস্প্ল্যানেড, শেয়ালদা, এছাড়াও নীহারিকার উল্লেখ রয়েছে।

❖ উল্লেখযোগ্য পংক্তি ঃ

- ''মালতী ঘোষাল তাঁর স্পষ্টস্বরে গাইলেন যখন এই
  পরবাসে রবে কে এ পরবাসে--।''
- 'দেবব্রত বিশ্বাসের উদাও গলায় একাত্মীকরণে'
- 'বাইশে বা অন্য কোনো দিন হয়তো বা দোসরা শ্রাবনে'
- 'তুমি যে সুদুর নীহারিকা যারা করে আছে ভিড়'
- 'প্রাণ পই, গান চাই শেয়ালদার বাস্তহারা শেভে।।'

Sub Unit - 8
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১ - ১৯৬০)

কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ৩০ অক্টোবর। পিতা হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মাতা হলেন ইন্দুমতী বসুমল্লিক। প্রথম স্ত্রীর নাম - ছবি বসু, দ্বিতীয় স্ত্রী - রাজেশ্বরী দত্ত। 'পরিচয়' পত্রিকা করেন ১৩৩৮ শ্রাবন এ (১৯৩১) ত্রৈমাসিক অবস্থায় পাঁচ বছর মাসিকে সাত বছর সম্পাদনা করেন। ২৫শে জুন ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে কবির প্রয়ান ঘটে।

- 'সংবর্ত' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৩৬০ (১৯৫৩) বঙ্গাব্দে, এর দ্বিতীয় সংস্করন প্রকাশ পায় ১৩৬২ (১৯৫৫) বঙ্গাব্দে।
- নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনের নির্বাচনে ১৩৬০ সালে শ্রেষ্ট কাব্যগ্রন্থরূপে সম্মানিত হয় 'সংবর্ত' কাব্যগ্রন্থ।
- 'সংবর্ত' কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয় 'আবু সয়ীদ আইয়ুব বন্ধুবরের করকমলে'।
- 'সংবর্ত' কাব্যের মোট কবিতা সংখ্যা - ২৩টি।

উল্লেখযোগ্য মন্তব্য :

- 'সুধীন্দ্রনাথের কাব্য যেন ভ্রষ্ট আদমের আর্তনাদ'
  [দীপ্তি ত্রিপাঠী; আধুনীক বাংলা কাব্য পরিচয়]
- 'মালার্মে প্রবর্তিত কাব্যদর্শই আমার অধিষ্ঠ'
  [সুধীন্দ্রনাথ দত্ত; 'সংবর্ত' ভূমিকা অংশ]
- "সুধীন্দ্রনাথের কবিতা দুর্বোধ্য নয়, দুরূহ এবং এই দুরূহতা অতিক্রম করা অল্পমাত্র আয়াস সাপেক্ষ।"
  [বুদ্ধদেব বসু; সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ]
- "জগতে ভগবান যদি না থাকেন, প্রেম ও ক্ষমা যদি অলীক হয়, তাহলে মানুষ তার অমর আকাঙ্খার উচ্চারণ করেই জগৎকে অর্থ দিতে পারে। এই আবেগের পরম ঘোষণা ১৯৪০ এ লেখা সংবর্ত কবিতা;"
  [বুদ্ধদেব বসু; সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য সংগ্রহ]

কবিতার নাম	কাব্যগ্রন্থ	কাব্যগ্রন্থের প্রকাশকাল	মোটস্তবক ও পংক্তি	কবিতার রচনাকাল	প্রথম লাইন	শেষ লাইন
১। জেস্‌ন	সংবর্ত	১৩৬০	স্তবক - ৮ পংক্তি -৭২	৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯	'বহু কষ্টে শিখেছি সাঁতার'	'দূরত্যয়, স্বস্থ, প্রগতিক'।
২। সংবর্ত	সংবর্ত	১৩৬০	স্তবক - ৬ পংক্তি -১৬৬	৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪০	'এখনও বৃষ্টির দিনে মনে তাকে',	'তা সুদ্ধ, জানি না'।
৩। যযাতি	সংবর্ত	১৩৬০	স্তবক - ৫ পংক্তি -১১০	১৮ মার্চ ১৯৫৩	'উত্তীর্ণ পঞ্চাশ, বনবাস প্রাচ্য প্রাজ্ঞদের মতে'	'যাকে কেন্দ্র করে ছোটে দিগবিদিকে সমুদ্র-না মরু ?

জেস্‌ন

গ্রীক মিথোলিজির জেস্‌ন - এর রূপকল্পে জীবনসমুদ্রে সন্তরশীল সুধীন্দ্রনাথের মুখচ্ছবির আমরা পাই আলোচ্য কবিতায়। পৌরানিক জেস্‌ন Golden fleece এর জন্য সমুদ্রাভিযানে বিপদাপন্ন হলেও গন্তব্যের অভিমুখে অগ্রসরমান ছিলেন। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের জেস্‌ন অগ্রগমন ও পশ্চাদপসরনের গানিতিক সাম্যে সমুবিন্দুতে স্থির। কবিতায় রয়েছে জোয়ার ভাঁটার রূপকে দ্বান্দ্বিক বিন্যাস। অনেকে কবি সুধীন্দ্রনাথের ব্যাক্তিজীবনের বাস্তবতার প্রতিফলনও লক্ষ করেছেন। ১৯৪২ - ১৯৪৩ এ প্রথমা স্ত্রী ছবি দত্তের সঙ্গে কবির বিবাহ বিচ্ছেদ, রাজেশ্বরী বাসুদেবকে বিবাহ; পরিচয় - এর সম্পাদকের দায়িত্ব পরিহাস, প্রকৃত ঘটনা কবিকে তার বন্ধুবৃত্ত থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। সেই বিষাদ পুঞ্জিভূত হচ্ছিল অলক্ষিভাবে। জৈবিক ও শৈল্পিক সৃজনহীনতার যন্ত্রনা ও বিষাদ যেন বানী বদ্ধরূপলাভ করেছে কবিতায়।

- ‘জেস্‌ন’ কবিতাটি ‘সংবর্ত’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। ‘সংবর্ত’ কাব্যগ্রন্থ প্রথম সংস্করণ - ১৩৬০ জ্যৈষ্ঠ। দ্বিতীয় সংস্করণ - ১৩৬২ সালে।
- ‘সংবর্ত’ কাব্যটি উৎসর্গ করা হয়েছে আবু সয়ীদ আইয়ুব বন্ধুবরের করকমলে।
- ‘জেস্‌ন’ কবিতার মোট স্তবক সংখ্যা - ৮টি, মোট পুংক্তি সংখ্যা - ৭২ টি।

উল্লেখযোগ্য পংক্তি :

- ‘সরে বা শৈবালে / কিংবা মৎস্যনারীদের সবুজ চুলের উনাজলে জড়ায় না তারা কানা মাছির মতন’।।
- “উচ্ছল অর্ণবপোতে স্বদেশের শ্রেষ্ট বীর যত
  গুরুদীক্ষা, বাহুবল; সহায় দৈবত . . .।”
- “স্বৈরিণীর অনুকম্পা, পেকেনি তাতেও।”
- “মুকুরিত মহাশূন্য, সমুদ্রের পিতা ও প্রতীক, / দূরত্যয়, স্বচ্ছ, প্রগতিক।।”

সংবর্ত

‘সংবর্ত’ অর্থাৎ প্রলয়কালীন মেঘ ঝড়। এক কথায় বিপর্যয়। কবি একটি বর্ষাপূর্ণ দুর্যোগকে সামনে রেখে স্মৃতিকথনের ভেতর দিয়ে একখানি প্রেমের কবিতা রচনা করেছেন। এক সংকটকালের মুখে দাঁড়িয়ে উওরচল্লিশে এসে নায়িকাকে স্মরন করে কালের সংকটে যে স্বাভাবিক নয়, তার অপমৃত্যু ঘটেছে এসব বলে তিনি সংসারে, সমাজে মানুষের জীবনযুদ্ধের ছবিগুলি এক এক করে এঁকে আমাদের সামনে নিখুঁত ভাবে তুলে ধরেছেন। এরপর কবি আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ভয়ংকর রূপ মারী আর খরার কথা। চার্চিলের স্বেচ্ছাচার বিশ্বজুড়ে কীভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে সাম্রাজ্যবাদীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে, এবং হিটলারের ফ্যাসিস্টবাদী একনায়কতন্ত্রের সন্ত্রাসের প্রসঙ্গকে উত্থাপন করেছেন কবি। কবিতাটির পরিবর্তী স্তবকগুলিতে রয়েছে স্বপ্নচারিতা; কবির দ্বিধাদ্বন্দ্বযুক্ত মনের পরিচয় এবং শেষ স্তবকে কবি প্রকাশ করেছেন মনোবেদনার কথা। বিশ্বযুদ্ধের ভয়ংকর পৈশাচিক ব্যাপার ও মানবতার বিনাশ কবির ভাবনাকে যে সজোরে ধাক্কা দিয়েছিল তা কবিতাটি পাঠ করলে উপলব্ধি করা যায়।

- ‘সংবর্ত’ কবিতার মোট স্তবক সংখ্যা - ৬টি।, পুংক্তি সংখ্যা - ১৬৬টি।
- কবিতায়, গ্যোটে, হ্যেল্ডার্লিন, রিল্কে, টমাস মানের মানোল্লেখ আছে।
- লেলিন, হিটলার, স্ট্যালিন, চার্চিলের নামোল্লেখ। এছাড়া চীন, স্পেন, ফরাসী দেশের নাম রয়েছে।

উল্লেখযোগ্য পংক্তি :

- “চুঁলের প্রলেপ ওড়ে নামমাত্র বাতাসে যখন।”
- ‘বিমানের ব্যুহ চতুর্দিকে,
  মাতরিশ্বা পরিভূ কবির কণ্ঠশ্বাস।’
- ‘গ্যেটে, হ্যেল্ডার্লিন, রিল্কে, টমাস্ মানের উপন্যাস’
- ‘কবন্ধ ফরাসীদেশ। সে এখনও বেঁচে আছে কি না / তা সুদ্ধ জানিনা’।।

যযাতি

পঞ্চাশোর্ধ্ব এক ব্যক্তির অভিজ্ঞতা আর নৈরাশ্য বিলাপে। এই কবিতা আমাদের মনে এক বিষাদ ও বেদনাবোধক সৃষ্টি করে। মহাভারতে যে যযাতিকে আমরা পাই, তাকে এক নবরূপ দান করেছেন কবি। যদি এখানে যযাতির গল্প মুখ্য নয়, মুখ্য আপাত যৌবনের জন্য আর্তি। প্রত্যশা ও প্রাপ্তির বিরোধ এ যুগের পদে পদে মানবজীবনের নিয়তিকে যেন ব্যক্তকরে এ কবিতা। আমরা সবাই যেন যযাতি। আপর, হতাশা জীবনানুরাগ নিয়ে আমরা দুর্লঙ্ঘ্য অসীমের ব্যূহে বন্দী। স্বর্ণময় অতীত কিংবা রঙিন ভবিষ্যৎ কিছুই আমাদের শান্তি দেয় না। শুধু শতাব্দীর অভিজ্ঞতা আমাদের ক্লান্ত করে এটাই এযুগের ভাষ্য।

- ‘যযাতি’র রচনাকাল ১৮ মার্চ ১৯৫৩।
- ‘যযাতি’ কবিতায় শর্মিষ্ঠা - দেবযানী, শুক্রাচার্য ও পুরুর নাম আছে।
- ‘যযাতি’ কবিতার স্তবক সংখ্যা - ১২টি এবং মোট পুংক্তি সংখ্যা - ১১০টি।
- প্রাচীর; পরিখা; রক্ষী, গুপ্তচর; ঘেরা প্রসাদের কথা আছে।

উল্লেখযোগ্য পংক্তি :

- ‘উত্তীর্ণ পঞ্চাশ; বনবাস প্রাচ্য প্রাজ্ঞদের মতে’
- ‘পুষ্ট চীন থেকে পেরু; প্রতিক্রিয়া মানে না সিন্ধর’
- ‘সিদ্ধি প্রার্থনীয় নয় সূত্রধার গণেশের কাছে;’
- ‘নাস্তিরই বিবর্তবাদ। এমনকি উপস্থিত হানি’
- ‘অজাত পুরুষ সঙ্গে ব্যতিহার্য নয় দুর্বিপাক।’
- ‘যাকে কেন্দ্র করে ছোটে দিগ্ বিদিকে সমুদ্র-না মরু ?’

teachinns Text with Technology

Sub Unit – 9
অমিয় চক্রবর্তী

আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম প্রধান কবি অমিয় চক্রবর্তী। অমিয় চক্রবর্তী হুগলী জেলার শ্রীরামপুরে মাতুলালয়ে ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে ১০ই এপ্রিল জন্ম গ্রহন করেন। কবির আদি নিবাস ছিল পাবনায় পদ্মাপারে। কবির পিতার নাম - দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্তী এবং মাতার নাম - অনিন্দিতা দেবী। কবির পুরো নাম - অমিয় চন্দ্র চক্রবর্তী। অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য-সচিব ছিলেন ১৯২৬ - ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। 'একমুঠো', 'পারাপার', 'পালাবদল', 'পুষ্পিত ইমেজ', 'ঘরে ফেরার দিন' তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যু পলজ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৬৩ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পান। ১২ই জুন ১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

উল্লেখযোগ্য মন্তব্য :

- "সমকালীন বাংলাদেশের সবচেয়ে আধ্যাত্মিক কবি অমিয় চক্রবর্তী। . . . . . সংগতি তাঁর সকল কাব্যের মূলমন্ত্র।"
  [বুদ্ধদেব বসু, কবিতা পত্রিকা]
- 'অমিয় চক্রবর্তী আঙ্গিকের একটা বিচিত্র আবহ'
  [দীপ্তি ত্রিপাঠী, আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়]
- "শব্দ ব্যবহারের ভঙ্গি যেমন তিনি কিছুটা হপকিন্সের কাছ থেকে সচেতনভাবে শিখেছেন তেমনি ছন্দ বাবহারেও খুব সাবলীলভাবে হপকিন্সের দারস্থ হয়েছেন।"
  [মঞ্জুভাষ মিত্র, আধুনিক বাংলা কবিতায় ইয়োরোপীয় প্রভাব]
- "আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে তিনি এ যুগের প্রবীন 'আধ্যাত্মিক' কবি - (কিন্তু) এই ধ্যানগম্ভীর সংগতির কবির প্রশান্তির অন্তরালে লুকিয়ে আছে এক দ্বন্দ্ব জর্জর আধুনিক মানস - এক অনিকেত ছিন্নমূল সত্তা - সমন্বয় যাঁর কাম্য কিন্তু আজও অপ্রাপনীয়।"
  [দীপ্তি ত্রিপাঠী]

নির্বাচিত কবিতা :

কবিতার নাম	কাব্যগ্রন্থের নাম	কাব্যগ্রন্থের প্রকাশকাল	প্রথম লাইন	শেষ লাইন
ঘর	'খসড়া'	১৯৩৮	'বাড়ি ফিরেছি'	'ফিরে আসার সাঁঝ'।
চেতনা স্যাকরা	'একমুঠো'	১৯৩৯	'সোনা মনাই। সাঁলের বাঁ পাশে গয়না'	সোনার মার নাও সঙ্গে পারো তো কিছু কিনো - থাক, চাইলে খদ্দের ধরতে।
'বড়োবাবুর কাছে নিবেদন'	'মাটির দেয়াল'	১৯৪১	তালিকা প্রস্তুত	'বাঁচবার সার্থকতা'
সংগতি	'অভিজ্ঞান বসন্ত'	১৯৪৩	'মেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া আর'	'মেলাবেন তিনি মেলাবেন'
বিনিময়	'পারাপার'	১৯৫৩	'তার বদলে পেলে'	'এও কি রেখে গেলে'।

ঘর

'ঘর' কবিতাটিতে কবি . . . . . প্রকৃতির অমোঘ সৌন্দর্যের প্রতি কবির মনের আকর্ষণ যেমন পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি কবির মনের টানও। কবির আপন চেনা জগৎ এখানে হয়ে উঠেছে আত্মার আত্মীয়। ঘরের প্রতি কবির মনের টান তথা বাড়ি ফেরার টান স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

- 'ঘর' কবিতাটি খসড়া (১৩৪৫ বঙ্গাব্দ) কাব্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।
- 'খসড়া' কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয় হৈমন্তী দেবীকে।
- 'ঘর' কবিতাটি 'খসড়া' কাব্যগ্রন্থের ২১তম কবিতা।
- 'ঘর' কবিতার মোট পংক্তি সংখ্যা - ১৮।
- 'স্বর' কবিতার স্তবকসংখ্যা - ৩টি প্রথম স্তবকে ৪টি চরণ, দ্বিতীয় স্তবকে ৪টি চরণ, একত্রে ও পঞ্চম চরণ একটু তফাতে, তৃতীয় স্তবকে ৯টি চরণ।
- 'কবিতা' পত্রিকায় 'খসড়া' সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসু বলেন -
  "বিস্ময়কর বই . . . একেবারে আধুনিক, একেবারেই অভিনব। . . . . মনে হয় 'খসড়া' প্রকাশের পরে অমিয় চক্রবর্তীকে উল্লেখযোগ্য আধুনিক বাঙালি কবিদের অন্যতম বলে মেনে নিতে আমাদের দ্বিধা করা উচিত নয়।"

উল্লেখযোগ্য পংক্তি :

- আমার পৃথিবী
  এখানেই শেষ।
- চোখের তৃষ্ণায় ফিরেছি।
- অনাত্ম সংসার দূরে গরজায়।
- সিঁড়ির কাছে চেনা কচি গলার আওয়াজ।
- ফিরে আসার সাঁঝ।

চেতনা স্যাকরা

'চেতনা স্যাকরা' কবিতাটি কবি চেতনার প্রতীকী ব্যঞ্জনা হিসেবে সমাজব্যবস্থার বিকৃত রূপটি তুলে ধরেছেন যেখানে তিনি দেখিয়েছেন সমাজের যা সুন্দর; স্বাভাবিক তা নষ্ঠ হয়ে যাওয়ার দৃশ্য দার্শনিক ভাবনা মর্মবাণী রূপস্পষ্ট চেতনার অন্তরালে স্বাস্থ্যকর সমাজব্যবস্থার নিগূঢ় ভাবনায় প্রকাশ পেয়েছে।

- 'চেতনা স্যাকরা' কবিতাটি 'কবিতা' পত্রিকার ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ কার্তিক সংখ্যায় (অক্টোবর - নভেম্বর ১৯৩৯) প্রকাশিত হয়।
- 'চেতনা স্যাকরা' কবিতাটি 'একমুঠো' কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম কবিতা।
- কবিতাটিতে মোট পুংক্তি সংখ্যা - ৫৬।
- 'চেতনা স্যাকরা' কবিতার সঙ্গে এলিয়েটের Prelude কবিতাটি করা হয়।
- 'একমুঠো' কাব্যের প্রথম সংস্করন - পৌষ ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ।
- অমিয় চক্রবর্তীর 'দুর্যোগের সাহিত্য' রচনাটিতে একটি কথার সঙ্গে চেতন স্যাকরা কবিতার কিছুটা মিল খুঁজে পাই -
  "সাহিত্যের কাজ আজও যা কালও তাই ছিল। অর্থাৎ সত্য বলা, সবখানি সত্য বলা। নিজের জীবনের অন্তযোগে নিঃসৃত যে প্রকাশ সেই আন্তরিক সর্বান্তিক সত্য ফুটিয়ে তুলতেই লেখকের সাহিত্যকথা।"

উল্লেখযোগ্য পংক্তি :

- 'কাচের বাক্রে, জানালায় দ্রষ্ঠব্য; জানলার উপর সয়না'।
- 'ড্রেন, ধুলো, মাছি, মশা, ঘেয়ো কুত্তোর'।
- 'অমৃতস্য অধম পুত্র, বন্দী সাঁৎসেঁতে গলির ঘরে ইঁদুর-ভরা',
- 'সুখ ভরা পান, দৃশ্য গুলিউড, মোক্ষের পিল্‌টি'।
- 'ভিড়ে কাচ ভেঙো না; বুলি, বুলি, রাম রাম বলো ময়না বলো ফার্শি, আরবি, ধার্মিক গজল - ফিরে গলির গর্তে'।

বড়োবাবুর কাছে নিবেদন

'বড়ো বাবুর কাছে নিবেদন' কবিতাটিতে বড়োবাবু নির্বাশিত কেরানির কাছ থেকে কী কী কেড়ে নিতে পারবে না তার একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন। যার মধ্যে আধুনিক বাস্তবতার বিষয়টিকে দৃঢ়দৃষ্টিতে অসাধারন নৈপুণ্যতায় উপস্থাপণ করেছেন। কবিতার মধ্য দিয়ে আত্মঅহংকার, আত্মগাম্ভীর্য যেখানে তিনি বলেছেন - বাস্তুভিটের অস্তিত্ব, চাকরের আমিত্ব, ভোরের আকাশ, কুয়োর ঠান্ডা জল, গ্রীষ্মের দুপুরে বৃষ্টি, ভালোবাসা, বহু চেষ্টা করে যা কেড়ে নেওয়া সম্ভব নয়। প্রসঙ্গ স্মৃতিবিদীর্ণ স্মৃতিচারণ করেছেন শত শতাব্দীর দূর সংসারে স্মৃতিরোমন্থনে বাঁচবার সার্থকতা কেরাণির মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন।

- 'বড়োবাবুর কাছে নিবেদন' কবিতাটি 'মাটির দেয়াল' কাব্যের অন্তর্গত।
- 'মাটির দেয়াল' কাব্যগ্রন্থ প্রথম সংস্করণ মাঘ ১৩৪৮, দ্বিতীয় সংস্করণ শ্রাবন ১৩৫০ কবিতাভবনের 'এক পয়সায় একটি' সিরিজের দ্বিতীয় গ্রন্থ।
- কবিতায় পংক্তি সংখ্যা - ২৭টি ও স্তবকসংখ্যা - ৫টি।
- 'আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়' - রচনাটি দীপ্তি ত্রিপাঠী, অমিয় চক্রবর্তী সম্পর্কে বলেছেন - "অমিয় চক্রবর্তী প্রকরণের বৈশিষ্ট্য তাঁর প্রচ্ছন্নতা, সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একটা মিল আছে।"

উল্লেখযোগ্য পংক্তি :

- হই না নির্বাসিত কেরানি।
- যতদিন বাঁচি ভোরের আকাশে চোখ জাগানো।
- দূর-সংসারে এলো কাছে
  বাঁচবার সার্থকতা।।

সংগতি

'সংগতি' কবিতার মাধ্যমে নবযুগের ইঙ্গিত করেছেন যেখানে - তিনি পৃথিবীর সমস্ত বিষয়ের মাধ্যমে সংগতি বিধানের একটি বাণী প্রয়োগ করেছেন। যেখানে পোড়ো বাড়ির সঙ্গে ভাঙা দরজার মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া আপাত দৃষ্টিতে কঠিন বলে মনে হলেও, কবি কোন এক শক্তির উপর আস্থা রেখে সংগতি বিধানের বিষয়টিকে পাথেয় করে তুলেছেন। পৃথিবীতে জীবনের ভাঙা-গড়া, সৃষ্টি-ধ্বংস ভালো-মন্দ সবকিছুকে পাশাপাশি রেখে সেগুলির মধ্যে মিলন সাধনে অর্থাৎ সংগতি বিধানে প্রয়াসী হয়েছেন কবি।

- 'অভিজ্ঞান বসন্ত' (১৩৫০) কাব্যগ্রন্থের চতুর্থ পর্যায় বা গুচ্ছ সূর্যখন্ডিত ছায়ার অন্তর্গত প্রথম প্রকাশ হয়। পরিচয় পত্রিকায় মাঘ, ১৩৪০ বঙ্গাব্দে (১৯৪)।
- 'অভিজ্ঞান বসন্ত' কাব্যের প্রথম সংস্করন - ১৩৫০।
- কবিতায় মোট পুংক্তিসংখ্যা - ৩৬।
- 'সংগতি' কবিতায় 'মেলাবেন' শব্দটি - ১১ বার ব্যবহৃত হয়েছে।
- কবিতায় মেলাবেন তিনি মেলাবেন কথাটি - ২ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য পংক্তি :

i) পোড়ো বাড়িটার / ঐ ভাঙা দরজাটা।
ii) মারী কুকুরের জিভ দিয়ে খেত চাটা,
iii) প্রান নেই, তবু জীবনেতে বেঁচে থাকা।
iv) দেবতা তবুও ধরেছে মলিন ঝাঁটা।
v) সমাজধর্মে আছি বর্মেতে আঁটা, / মেলাবেন তিনি মেলাবেন।

বিনিময়

'বিনিময়' কবিতায় কবি ব্যক্তিজীবনের পার্থিব বিষয় আসয় নয় মনোজাগতিক প্রশান্তির বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে। যেখানে ব্যক্তির মনের চাহিদা পূরনের আকাঙ্খা রয়েছেন। স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে পরাধীনতা, সুখ বিসর্জন দিয়ে, দুঃখ গ্লানি বরন করার দৃশ্য কবিতায় স্পষ্ট। কবিতায় মূলত সর্বস্ব হারানোর এক নৈসঙ্গিক মনোবেদনার মনোযন্ত্রনার চিত্র।

- কবিতাটি 'পারাপার' (১৯৬০) কাব্যগ্রন্থের 'ছড়ানো মার্কিনি' এর অন্তর্গত পঞ্চম কবিতা।

- কবিতার পুংক্তিসংখ্যা - ১৬।

উল্লেখযোগ্য পংক্তি :

i) তার বদলে পেলে / সমস্ত ঐ স্তব্ধ পুকুর।
ii) একলা বুকে সবই মেলে।
iii) ফিরে কেউ-না-চাওয়া / এও কি রেখে গেলে।।

teachinns
Text with Technology

Sub Unit - 10
সমর সেন (১৯১৬ - ১৯৮৭)

কবি সমর সেনের জন্ম কলকাতার বাগবাজারে বিশ্বকোষ লেন-এর বাড়িতে। আদি নিবাস ঢাকা মানিকগঞ্জ, সুয়াপুর। পিতা অরুণচন্দ্র সেন। মাতা চন্দ্রমুখী দেবী ছিলেন বঙ্কিম-বান্ধব জগদীশনাথ রায়ের দৌহিত্রী। পিতামহ দীনেশচন্দ্র সেন ছিলেন বাংলা সহিত্যের প্রখ্যাত লেখক ও ইতিহাস প্রণেতা। তিনের দশকে কবিতা লেখা শুরু করেন। তাঁর কবিতার বিষয় ও রীতির বিশিষ্টতা বিদ্বজনের দৃষ্টি আকর্ষন করে। বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত ত্রৈমাসিক 'কবিতা' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক (১৯৩৪) খ্যাতির শীর্ষে থাকার সময় ১৯৪৬ খ্রিঃ হঠাৎই কবিতা লেখা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। নতুন কাব্যরীতি ও রোমান্টিকতাবর্জিত তীক্ষ্ণ ভাষা প্রয়োগ সমর সেনের কবিতাকে স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করেছে। তাঁর কবিতা গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে 'গ্রহন', 'নানাকথা', 'খোলাচিঠি', 'তিনপুরুষ'। সমর সেনের কবিতা, প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ খ্রিঃ। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'বাবুবৃত্তান্ত' ১৯৭৮ এ প্রকাশিত হয়।

- ১৯৬৪ সালের এপ্রিলে হুমায়ুন কবীরের আহ্বানে 'নাও' পত্রিকার সহ-সম্পাদক হন। নাও থেকে বিতারিত হবার হপ্তাদুয়েক পরে নতুন পত্রিকা-'ফ্রন্টিয়ার' এর প্রস্তুতি শুরু করেন। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হত বাংলা নববর্ষে। এছাড়া 'কবিতা' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক সমর সেন। তৃতীয় বছর থেকে যুগ্ম সম্পাদক।

❖ উল্লেখযোগ্য মন্তব্য ঃ

- "Samar Sen is an upto date representative poet. He needs to be progressive informing himself with a sense of history.' (ধূর্জাটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়)।
- সাহিত্যে এর লেখা টেকসই হবে বলেই বোধ হচ্ছে। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।
- 'সমরের বিষাদ যৌবনোচিত বাসনা ও ক্লান্তির নীতিতেই উৎস খোঁজে। ফলে অন্যমনস্কের কাছে কয়েকটি কবিতা একঘেয়ে লাগতে পারে। (বিষ্ণু দে ; 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' প্রবন্ধে)।

কবিতার নাম	রচনাকাল	প্রথম লাইন	শেষ লাইন
মেঘদূত	১৯৩৪-১৯৩৭	পাশের ঘরে একটি মেয়ে ছেলেভুলানো ছড়া গাইছে।	কী আনন্দ পাও সন্তান ধারণে
মহুয়ার দেশ	১৯৩৪-১৯৩৭	মাঝে মাঝে সন্ধ্যার জলস্রোতে অলস সূর্য দেয় এঁকে।	কিসের ক্লান্ত দুঃস্বপ্ন
একটি বেকার প্রেমিক	১৯৩৪-১৯৩৭	চোরবাজারে দিনের পর দিন ঘুরি	বনিক সভ্যতার শূন্য মরুভূমি
উর্বশী	১৯৩৪-১৯৩৭	তুমি কী আসবে আমাদের মধ্যবিত্ত রক্তে।	আর কত দিন
মুক্তি	১৯৩৪-১৯৩৭	হিংস্র পশুর মতো অন্ধকার এলো	নির্জন দ্বীপের মতো সুদূর নিঃসঙ্গ

মেঘদূত

পাশের এক ঘরে একটি মেয়ে ছেলে ভুলানোর গান গাইছে।- সে সুর ক্লান্ত এবং ঝরে যাওয়া পাতার মতো হাওয়ায় ভাসছে। বর্ষাকালে যখন চারিদিক ভেসে যাবে তখন তোমার মনে মিলনের সাধ জাগ্রত হবে। মেয়েটিকে তাই প্রশ্ন করে কবি প্রেমে কি আনন্দ আর সন্তান ধারণেই বা কি আনন্দ।

- সমর সেনের 'মেঘদূত' কবিতাটি ১৯৩৪ -১৯৩৭ এর সময় পর্বে রচিত।
- মেঘদূত কবিতার স্তবক সংখ্যা ২টি।
- মেঘদূত কবিতার পংক্তি সংখ্যা ১৫টি।

❖ **উল্লেখযোগ্য পংক্তি ঃ**

- পাশের ঘরে
  একটি মেয়ে ছেলে ভুলানোর ছড়া গাইছে।
- তোমার মনে তখন মিলনের বিলাস
  ফিরে তুমি যাবে বিবাহিত প্রেমিকের কাছে।
- হে ম্লান মেয়ে ; প্রেমে কী আনন্দ পাও,
  কি আনন্দ পাও সন্তান ধারণে?

মহুয়ার দেশ

অলস সূর্য সন্ধ্যার জলস্রোতে গলিত সোনার মতো উজ্জ্বল আলোর স্তম্ভ এঁকে দেয়। শীতের দুঃস্বপ্নের মতো ধোঁয়ার বঙ্কিম নিঃশ্বাস ঘুরে ফিরে আসে। অনেক দূরে আছে মহুয়ার দেশ। পথের দুধারে সেখানে দেবদারু ছায়া ফেলে। মহুয়া বনের ধারে কয়লাখনির মধ্য শব্দশোনা যায় আর সকাল অবসানে মানুষের শরীরে দেখা যায় ধুলোর কলঙ্ক। ঘুমহীন তাদের চোখে দেয় হানা কিসের ক্লান্ত দুঃস্বপ্ন।

- 'মহুয়ার দেশ' কবিতাটি ১৯৩৪ -১৯৩৭ এর সময় পর্বে রচিত।
- 'মহুয়ার দেশ' কবিতায় স্তবক সংখ্যা ২টি।
- কবিতাটির মোট পংক্তি সংখ্যা ২২টি।
- প্রথম স্তবকে ১৪টি পংক্তি ও দ্বিতীয় স্তবকে ৮টি পংক্তি আছে।
- কবিতাটি 'কয়েকটি কবিতা ও গ্রহন' কাব্যগ্রন্থ (১০৪০) থেকে নেওয়া হয়েছে।

একটি বেকার প্রেমিক

কবি চোরাবাজারে দিনের পর দিন ঘুরে বেড়ান। সকালে ক্লান্ত গনিকারা কলতলায় কোলাহল করে। খিদিরপুরে ডকে জাহাজের শব্দ শোনা যায়, কবির ঘুম না এলে ফিরিঙ্গি মেয়ের উদ্ধত নরম বুক দেখেন। আর বলেন -মৃত্যুহীন প্রেম থেকে মুক্তি দাও উদয় নতুন পৃথিবীর। সকালে ঘুম ভাঙে আর সমস্তক্ষন রক্তে জ্বলে বনিক সভ্যতার শুন্য মরুভুমি।

- কবিতাটির পংক্তি সংখ্যা ১৫।
- খিদিরপুর ডকে জাহাজের আওয়াজের প্রসঙ্গ আছে।
- সকালে গণিকাদের কোলাহল শোনা যায় কলকাতায়।

❖ **উল্লেখযোগ্য পংক্তি ঃ**

- হে প্রেমের দেবতা ঘুম যে আসেনা, সিগারেট টানি।
- মৃত্যুহীন প্রেম থেকে মুক্তি দাও
  পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী আনো
- আর সমস্তক্ষণ রক্তে জ্বলে
  বনিক সভ্যতার শুন্য মরুভূমি।

উর্বশী

ক্লান্ত উর্বশীকে আহ্বান করেছেন কবি, মধ্যবিত্তের রক্তে আসার জন্য। চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে যেমন তরে বিষণ্ন বদনে উর্বর মেয়েরা আসে। মিশে যাবো কত অতৃপ্ত রাত্রির ক্ষুধিত ক্লান্তি কত দীর্ঘশ্বাস, কত সবুজ সকাল তিক্ত রাত্রির মতো।

- কবিতাটির পংক্তি সংখ্যা ১০।
- কবিতাটি ১৯৩৪-১৯৩৭ এর সময় পর্বে রচিত।
- চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের প্রসঙ্গ আছে।

❖ **উল্লেখযোগ্য পংক্তি ঃ**

- তুমি কি আসবে আমাদের মধ্যবিত্ত রক্তে।
  দিগন্তে দূরন্ত মেঘের মতো।
- কত অতৃপ্ত রাত্রির ক্ষুধিত ক্লান্তি।
  কত দীর্ঘশ্বাস
  কত সবুজ সকাল তিক্ত রাত্রির মতো
  আরো কত দিন!

মুক্তি

অন্ধকার এল হিংস্র পশুর মতো পশ্চিমবঙ্গের আকাশ রক্ত করবীর মতো লাল ; মাটিতে কেতকীর গন্ধ; সেই অন্ধকার কুমারীর দেহে কামনার চিহ্ন এঁকে দেয়। কিন্তু পাহাড়ের ধূসর স্তব্ধতায় কবিকে শান্ত ও সুদূর নির্জন দ্বীপের মতো নিঃসঙ্গ করে রেখেছে।

- কবিতাটির স্তবক সংখ্যা ২।
- কবিতাটির পংক্তি সংখ্যা ১২।
- প্রথম স্তবকে ৭টি চরণ ও দ্বিতীয় স্তবকে ৫ টি চরণ আছে।
- মুক্তি কবিতায় যে ফুলের নাম আছে - রক্তকরবী, কেতকী।
- উপমা ঃ তখন পশ্চিমের জলন্ত আকাশ রক্তকরবীর মতো লাল।

❖ **উল্লেখযোগ্য পংক্তি ঃ**

- সে অন্ধকার জ্বেলে দিল কামনার কল্পিত শিখা
  কুমারীর কমনীয় দেহে।
- আমার অন্ধকারে আমি
  নির্জন দ্বীপের মতো সুদূর নিঃসঙ্গ।

teachinns Text with Technology

Sub Unit - 11

সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯ - ২০০৩)

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৯১৯ সালে মাঘ সংক্রান্তিতে, কৃষ্ণনগর জেলায় জন্মগ্রহন করেন। পিতা ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মাতা যামিনীবালা দেবী। ১৯৪০ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পদাতিক' প্রকাশিত হয়। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ গুলির মধ্যে রয়েছে 'অগ্নিকোণ', 'চিরকূট', 'ফুল ফুটুক', 'যতদূরে যাই', 'কাল মধুমাস', প্রভৃতি। তিনি 'হাফিজ হিকমত' ও 'পাবলো নেরূদার' কবিতা অনুবাদ করেছেন। সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি জ্ঞানপীঠ পুরস্কার লাভ করেন।

- ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের যুগ্ম সম্পাদক। পরে প্রতিষ্ঠানের নাম বদলে হয় অন্যতম প্রধান সংগঠক।

উল্লেখযোগ্য মন্তব্য :

- "কবি হিসাবে শ্রীযুক্ত সুভাষ মুখোপাধ্যায় সুপরিচিত এবং প্রতিষ্ঠিত। নানা পত্র - পত্রিকায় কাব্য - সংকলনে তাঁর কবিতা এতদিনে মুগ্ধ বিস্ময়ে পড়ে এসেছি।" [সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় - 'মহোঞ্জোদাড়ো' পত্রিকা]
- সুভাষ মুখোপাধ্যায় একজন ইজেজিস্ট কবি, চিত্তচমৎকুমারী তাঁর ছন্দ, বেশ তাঁর কবিতায় সঙ্গে তুলনীয় সাম্প্রতিক কোন কবিতা সমালোচক পাননা। [সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় - মহোঞ্জোদারো পত্রিকা]
- "তাঁর অভিনবত্ব পদে পদেই চমক লাগায়। . . . . মাত্র কয়েকটি কবিতা লিখে তিনি সংশয়ে প্রমান করেছেন যে তিনি শক্তি মান।" [বুদ্ধদেব বসু; কালের পুতুল]
- "তিনি বোধ হয় প্রথম বাঙালি কবি যিনি প্রেমের কবিতা লিখে কাব্য জীবন আরম্ভ করলেন না। এমনকি প্রকৃতি - বিষয়ক কবিতাও তিনি লিখলেন না।" [বুদ্ধদেব বসু; কালের পুতুল]

কবিতার নাম	মূলকাব্য ও রচনাকাল	প্রথম লাইন	শেষ লাইন
প্রস্তাব : ১৯৪০	পদাতিক ১৯৩৮ - ১৯৪০	প্রভু যদি বল অনুক রাজারা সাথে লড়াই	চোখ বুজে কোনো কোকিলের দিকে ফেরাব কান
মিছিলের মুখ	অগ্নিকোন ১৯৪৮	মিছিলে দেখেছিলাম একটি মুখ মুষ্টিবদ্ধ একটি শানিত হাত	দুটি হৃদয়ের সেতু পথে পারাবার করতে পারে।
ফুল ফুটুক না ফুটুক	ফুল ফুটুক ১৯৫১ - ১৯৫৭	ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত	দড়ি পাকানো সেই গাছ তখন হাসছে।
যেতে যেতে	যতই দূরেই যাই ১৯৬২	তারপর যেতে যেতে যেতে এক নদীর সঙ্গে দেখা	তারপর ? কী বলব সেই রাক্ষুসীই আসকে খেল।
পাথরের ফুল	যত দূরেই যাই ১৯৬২	ফুলগুলো সরিয়ে নাও আমার লাগছে।	আমাকে ফুলের সমস্ত ব্যাখ্যা ভুলিয়ে দিক।
কাল মধুমাস	কাল মধুমাস ১৯৬৬	বার বার ফিরে ফিরে আসা নয় পারাপার।	বললাম তা কারণ যা তখন আমাকে নিয়ে যন্ত্রণায় নীল।

প্রস্তাব ১৯৪০

কবি প্রতিবাদী মানসিকতায় বলেছেন তিনি মৃত্যুকে ভয় করেন না। বেকাররা মৃত্যুকে ভয় করে না। তীর ধনুক নিয়ে কবি প্রতিবাদ করতে বলেছেন। এতদিন অস্ত্র মেলেনি তাই তান ভেঁজেছি আজ আর তান নয়, কোকিলের দিকে চোখ না ফিরিয়ে যুদ্ধে প্রাণ দেবেন।

- কবিতাটি ১৯৩৮ - ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে 'পদাতিক' কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয়।
- কবিতাটি কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর বাব ও মাকে উৎসর্গ করেছিলেন।
- কবিতার স্তবক সংখ্যা ৪টি ও লাইন সংখ্যা ৪টি ও মোট লাইন সংখ্যা ১৭টি।
- 'প্রস্তাব ১৯৪০' কবিতাটির প্রচ্ছদ শিল্পী হলেন অনিল ভট্টাচার্য।
- কবিতাটির প্রথম সংস্করণ হয় ফেব্রুয়ারি ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ।

উল্লেখযোগ্য পুংক্তি :

- 'কোনো দ্বিরুক্তি করব না; নেবো তীর ধনুক
  এমনি বেকার; মৃত্যুকে ভয় করি থোড়াই;'
- 'হে সত্তদাগর, - সেপাই, সান্ত্রি সব তোমার'।
- 'অস্ত্র মেলেনি এতদিন; তাই ভেঁজেছি তান।
  অভ্যাস ছিল তীর-ধনুকের ছেলেবেলায়'।
- 'চোখ বুঁজে কোনো কোকিলের দিকে ফেরাব কান।'।

মিছিলের মুখ

কবি মিছিলে একটি মুখ দেখেছিলেন, মুষ্টিবদ্ধ শানিত হাত আকাশের দিকে নিক্ষিপ্ত। জনসুমদ্রের মাঝে সেই মুখ ফসফরাসের মত জ্বলজ্বল করছিল। কবি সেই কুঞ্চিত মুখ আহ্বান করেছেন বারবার।

- 'মিছিলের মুখ' কবিতাটি 'অগ্নিকোণ' (১৯৪৮) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।
- কবিতাটি 'অগ্নিকোণ' কাব্যের চতুর্থ কবিতা।
- কবিতাটি কবি সিঙ্গাপুরে যে তিনজন শহীদ ব্রিটিশের ফাঁসি কষ্ঠে আন্তর্জাতিক গান গাইতে গাইতে প্রাণ দিয়েছে তাদের কে উৎসর্গ করেছেন।
- এই কবিতায় মোট স্তবক সংখ্যা - ৫টি ও পংক্তি সংখ্যা - ৩৮টি।

উল্লেখযোগ্য পুংক্তি :

- 'মিছিলে দেখেছিলাম একটি মুখ',
- 'ফস্‌ফরাসের মতো জ্বলজ্বল করতে মিছিলের সেই মুখ'।
- "আমাকে উজ্জীবিত করে সমুদ্রের একটি স্বপ্ন মিছিলের একটি মুখ।"
- "আর সমস্ত পৃথিবীর শৃঙ্খলমুক্ত ভালোবাসা
  দুটি হৃদয়ের শেতুপথে
  পারাপার করতে পারে।।"

ফুল ফুটুক না ফুটুক

ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত। শানবাঁধানো ফুটপাতে এক কাঠখোট্টা গাছ। রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কালো আইবুড়ো মেয়ে। তার গায়ে প্রজাপতি এসে বসল। সে ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। যার বিয়ের কোনো সম্ভাবনা নেই তার স্বপ্ন দেখতে নেই। অন্ধকারে মুখে চাপা দিয়ে যেন দড়িপাকানো গাছটা হাসছে।

- কবিতাটি 'ফুলফুটুক' (১৯৩১ - ৫৭) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।
- কবিতায় কাঠখোট্টা একটি গাছের উল্লেখ আছে।
- কবিতায় প্রজাপতির উল্লেখ আছে।

- কবিতাটির স্তবক সংখ্যা - ৬টি এবং পুংক্তি সংখ্যা - ১টি।
- সিদ্ধার্থ দাসগুপ্ত সম্পদিত 'কালপুরুষ' পত্রিকায় (৩য় বর্ষ / ১ম খন্ড) ১৩৮৪ সংখ্যায় প্রকাশিত অলোক রঞ্জন দাসগুপ্তকে একটি চিঠিতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় জানায় -
  "ফুল ফুটুক না ফুটুক লিখেছিলেন সম্ভবত ৫৬' সালে। . . . . লিখেছিলাম কলকাতায় হয় বাড়িতে বসে নয় চা খানায় কিংবা ছাপাখানায়। তবে এটা মনে আছে যে গোড়ার ৬লাইন অগোছালোভাবে কয়েকটা টুকরো কাগজে বছর তিন চার আগে অসম্পূর্ণ অবস্থায় খসড়া করা ছিল।"

উল্লেখযোগ্য পংক্তি :

- ফুল ফুটুক না ফুটুক / আজ বসন্ত
- 'এ-গলির এক কালোকুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়ে
  রেলিঙে বুক চেপে ধরে'
- "অন্ধকারে মুখ চাপা দিয়ে / দড়িপাকানো সেই গাছ
  তখনও হাসছে।।"

যেতে যেতে

যেতে যেতে এক নদীর সঙ্গে দেখা যার পায়ে ঘুঙুর বাঁধা এবং পরনে নীল ঘাগরা। এই নদীর দুটি মুখ একটি মুখ ছুটে চলে গেল অন্য মুখে এসে সান্তনা দেয় কাঁধে হাত রাখে দের ভরসা।

আলোজ্বালা প্রকান্ত শহরে স্বর্গের শিড়িতে বসে এক পরমাসুন্দরী রাজকন্যা যে কবির আঙুলে আঙুল জড়াল এবং বলল সে কবির জন্য অপেক্ষা করছিল। সে বোঝাল যে তুমি আশা, তুমি আমার জীবন। এই গল্পটা রোমান্টিক গল্প বলে বুড়োদের ভালো লাগছে আগের গল্পটা ভালো নি তাতে রোমান্টিকতা ছিল না বলে।

- 'যেতে যেতে' কবিতাটি 'যত দূরেই যাই' (১৯৫৭ - ১৯৬০) কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয়।
- কবিতাটি কবি বন্ধু অশেষ ঘোষকে উৎসর্গ করেছেন।
- 'যত দূরেই যাই' কাব্যটির জন্য কবি ১৯৬৪ সালে সাহিত্য আকাদেমি পুরষ্কার পান।
- কবিতাটি দুটি পর্যায়ভক্ত।

উল্লেখযোগ্য পংক্তি :

- 'তারপর যে-তে যে-তে যে-তে
  এক নদীর সঙ্গে দেখা'।
- 'গল্পটার কোনো মাথা মুন্ডু নেই বলে
  বড়োধাড়িদের একেবারেই / ভালো লাগল না'।
- 'দেখি চুল এলো করে বসে আছে
  এক পরমা সুন্দরী রাজকন্যা'।. . . .
- 'তারপর ? কী বলব -
  সেই রাক্ষুসিই আমাকে খেল'।।

পাথরের ফুল

পাথরের ফুল কবিতাটি তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ে কবি বলছেন এক মৃতদেহের প্রতিবাদ সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত রাস্তায় দাঁড় করিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আর তার গলায় মালার পর মালা চাপানো হচ্ছে মৃতসবের পাথরের মতো মনে হচ্ছে ফুলের মালা, লোকটা কার মুখ দেখে উঠেছিল তার এমন দশা বলে কবি আক্ষেপ করছেন।

দ্বিতীয় স্তবকে শবদেহ নিয়ে সভার আয়োজন। তার ছেলে ছেঁড়া জামা পরে এক কোনে বসে আছে। কবি তাকে আশ্বাস দেয় তৃতীয় স্তবকে কবি বলছেন ফুল পছন্দ করেন করেন না পছন্দ করেন আগুনের ফুলকি কারণ সে মিথ্যা বলেনা।

- ‘পাথরের ফুল’ কবিতাটি ‘যত দূরেই যাই’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত পঞ্চম কবিতা।
- ‘পাথরের ফুল’ কবিতাটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু উপলক্ষে লেখা। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের লেখা ‘বাইশে শ্রাবণ’ কবিতার সঙ্গে এ কবিতার সাদৃশ্য আছে।

উল্লেখযোগ্য পংক্তি :

- ‘পাথরটা সরিয়ে নাও / আমার লাগছে’।
- ‘ফুলের দোকানে ভিড় ।
  লোকটা আজ কার মুখ দেখে উঠেছিল?’
- ‘ফুলের ওপর কোনোদিনই আমরা টান নেই।’
- ‘স্তূপাকার কাঠ আমাকে নিক’।

কাল মধুমাস

যৌবন পেরিয়ে জীবনের শেষ সীমান্তে এসে কবি স্মৃতিচারণা করেছেন - চাষির বীজবোনা ট্রাম, ধুতি পরা লোক তুবড়ি, দেশালাই, নানারকমের ফল, হারাধনবাবু বুড়ি পিসিমা যেমন ছিল তেমনই আছে। জীবনের শৈশব . . . . বাধর্ক্য পর্যায়ের মনের আকাঙ্খা, ইচ্ছা, বাসনা, সমস্ত বিষয়গুলিকে তিনি দেখিয়েছেন। কাল মধুমাস - তবুও কবি যন্ত্রণায় নীল।

- ‘কাল মধুমাস’ কবিতাটি ‘কাল মধুমাস’ (১৯৬৬) কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতা।
- কবিতাটি আকৈশোর আমার কবিতার অক্লান্ত পাঠক রামকৃষ্ণ মৈত্র বন্ধুবরেষুকে উৎসর্গ করেছেন।
- ‘কাল মধুমাস’ কবিতাটি ৬টি পর্যায়ে বিভক্ত।
- অরুন সেন ‘কাল মধুমাস’ কাব্যগ্রন্থ বিষয়ে ‘পরিচয়’ পত্রিকায় লেখেন -
  “চল্লিশের কবিদের মধ্যে আমাকে সবচেয়ে টানে সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং মনীন্দ্র রায়ের কবিতা। মনীন্দ্র রায়ের ‘কালের নিস্বন’ গত বছর বেরিয়েছে এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘কাল মধুমাস’ এ বছর জ্যৈষ্ঠে। দুজনকেই এখন সময়কে নিয়ে ব্যস্ত দেখা যাচ্ছে।”

উল্লেখযোগ্য পুংক্তি :

- “এখন কথাটা হল, / কখন কী ভাবে / যাবে -
  আকাশের কেমন আবহাওয়া।”
- ‘ইদানীং ডান কানে / ইস্ / একদম শুনছি না -’
- ‘আজ বছরের এই প্রথম মরশুম . . .।’
- ‘নাম নওগাঁ / আজ মফস্বলে এক নগন্য শহর।’
- ‘ছোট্ট তিন ফুট উঁচু ঢিবিটায় উঠে তিনি রোজ ...’
- ‘কাঁথিতে কোথাও কোনো সমুদ্রের ধারে’
- ‘রা তখন আমাকে নিয়ে মন্ত্রণায় নীল।।’

Sub Unit - 12
শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩-১৯৯৫)

শক্তি চট্টোপাধ্যায় ১৯৩৩ সালে দক্ষিন চব্বিশ পরগনার বহড়ুগ্রামে তাঁর জন্ম। ছোটোবেলাতেই তিনি বাবাকে হারান। এরপর ১৯৪৮ সাল থেকে তিনি কলকাতায় বসবাস করতে শুরু করেন। বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় 'যব' নামের কবিতাটি লিখে তিনি সাহিত্য রসিকদের চোখে পড়েন। কবিতা সাপ্তাহিকী পত্রিকা প্রকাশ করে তিনি আলোড়ন তুলেছিলেন কবিতাজগতে। এছাড়াও 'প্রগতি' নামের হাতের লেখা পত্রিকা প্রকাশ করেন যা পরে 'বহ্নিশিখা' নামে প্রকাশিত হয়। তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ৫১। বিশ্বভারতীতে সৃষ্টিশীল সাহিত্যের অতিথি-অধ্যাপক থাকাকালীন হঠাৎ হৃৎরোগে আক্রান্ত হয়ে ২৩ মার্চ, ১৯৯৫ সালে শান্তিনিকেতনে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

তথ্য

- ১৯৭০-৯৪ এই সময় তিনি আনন্দবাজার পত্রিকায় চাকরি করতেন।
- এক সময় 'রূপচাঁদ পক্ষী' ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন।
- 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাব' কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি ১৯৮৩ তে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পান।
- প্রথম রচনা 'নিরুপমের দুঃখ'।
- প্রথম কাব্য 'হে প্রেম, হে নৈঃশব্দ' (১৩৬৭)
- প্রথম উপন্যাস 'কুয়োতলা' (১৯৬১)
- ১৯৬২ তে 'হাংরি আন্দোলন'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।
- বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় 'যব' কবিতা লিখে সাহিত্যজগতে প্রবেশ।
- তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এছাড়াও 'ভারবি' কৃত্তিবাস পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।
- শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যসাধনার দুটি উপাদান - জীবনভাবনায় আসক্তি ও নিরাসক্তি।
- ১৯৭৫ এ 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাব' কাব্যগ্রন্থের জন্য আনন্দ পুরস্কার পান।
- ১৯৯৪ এ পেয়েছে সম্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গঙ্গাধর মেহের স্মৃতি পুরস্কার পান।
- পদ্যবন্ধ পত্রিকায় দেয়া এক সাক্ষাৎকারে শক্তি চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন -
  ''ধর্মে আছো জিরাফেও আছো'তে রবীন্দ্রনাথের মতো ভাষায় লেখার চেষ্টা করেছি। এর একটা কারন ছিল। তখন অনেকেই বলত আধুনিক কবিতা সাধারণের জন্য নয়।

[পদ্যবন্ধ ; শারদসংখ্যা ১৩৮৭]

কবিতার নাম	মূলকাব্য ও রচনাকাল	পত্রিকা	প্রথম লাইন	শেষ লাইন
অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছ	ধর্মে আছো জিরাফেও আছো (১৯৬৫)		দেওদয়ালির আলো মেখে নক্ষত্র গিয়েছে পড়ে কাল সারারাত	অনন্ত কুয়ার জল চাঁদ পড়ে আছে
আনন্দ ভৈরবী	ধর্মে আছো জিরাফেও আছো (১৯৬৫)	নান্তীমুখ পত্রিকা	আজ সেই ঘরে এলায়ে পড়েছি ছবি।	উদ্যানে ছিলো বরষা পীড়িত ফুল আনন্দ ভৈরবী
অবনী বাড়ি আছো	ধর্মে আছো জিরাফেও আছো (১৯৬৫)		দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া কেবল শুনি রাতের কড়া নাড়া	সহসা শুনিবায়ের কড়ানাড়া 'অবনী বাড়ি আছো?'
চাবি	ধর্মে আছো জিরাফেও আছো (১৯৬৫)	কৃত্তিবাস	আমার আছে এখনো পড়ে আছে	লিখিও উহা ফিরত চাহো কিনা?
হেমন্তের অরন্যে আমি পোষ্টম্যান	হেমন্তের অরন্যে আমি পোষ্টম্যান		হেমন্তের অরন্যে আমি পোষ্টম্যান ঘুরতে দেখেছি অনেক	একটি গাছ হতে অন্য গাছের দূরত্ব বাড়তে দেখেনি আমি

যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো	যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো (১৯৮২)	দেশ	ভাবছি ঘুরে দাঁড়ানোই ভালো	একাকী যাবোনা অসময়ে

অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছে

দেওয়ালির আলো মেখে নক্ষত্র পুড়েছে কাল সারারাত । এবার নক্ষত্র খামারে তোমাকে নিয়ে যাবো বলেছেন কবি নবান্নের দিন। কবি বলেছেন তাদের অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছে।

- শক্তি চট্টোপাধ্যায় এই কবিতাটি 'ধর্মে আছো জিরাফেও আছো' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।
- আশ্বিন ১৩৭২ (অক্টোবর ১৯৬৫) 'ধর্মে আছো জিরাফেও আছো' কাব্যগ্রন্থের প্রথম প্রকাশকাল।
- এই কবিতাটির স্তবক সংখ্যা ৪টি।
- এই কবিতাটির পুংক্তি সংখ্যা ১৮টি।
- কবিতাটি কবি 'আধুনিক কবিতার দুর্বোধ্য পাঠকের হাতে' উৎসর্গ করেছেন।
- এ গ্রন্থের নামটি যে কবিতা থেকে গ্রহণ হয়েছে তা হল -'পরমেশ্বর তুমি' উক্ত কবিতার শেষ ছত্র -
  'হে পরমেশ্বর, তুমি ধর্মে আছো জিরাফেও আছো।।'

❖ উল্লেখযোগ্য পংক্তি ঃ

- 'দেওয়ালির আলো মেখে নক্ষত্র গিয়েছে পুড়ে কাল সারারাত।'
- 'মনে হয় হৃদয়ের আলো পেলে সে উজ্জ্বল হতো'
- 'পর্দাগুলি নিয়ে যাবো, নিয়ে যাবো শেফালির চারা'
- 'এবারে তোমাকে নিয়ে যাবো আমি নক্ষত্র খামারে নবান্নের দিন'
- 'ভুলে মেয়োনাকো তুমি আমাদের উঠানের কাছে'

আনন্দ ভৈরবী

উদ্যানে বরষা পীড়িত ফুল, আষাঢ় শেষের বেলা এমন ছিল না। এখন আর রাখাল আসে না ; মোহন বাঁশি ও কাঁদে না। সে জানত না রাজধানী মত এ হৃদয় বড় নয়, সে জানত না যে কবি তাকে আনন্দ সমুদ্দরের মত জানেন।

- কবিতাটি 'ধর্মে আছো জিরাফেও আছো' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।
- 'আনন্দ-ভৈরবী' কবিতার প্রকাশকাল ১৩৭০ সালে পৌষ মাসে 'নান্দীমুখ' পত্রিকায়।
- 'আনন্দ ভৈরবী' কবিতার স্তবক সংখ্যা ৫টি। প্রতিটি স্তবকে চারটি করে চরণ আছে। আর্থাৎ কবিতাটিতে মোট ২০টি চরণ আছে।
- আনন্দ ভৈরবী কবিতাটি আষাঢ় মাসের বর্ষা প্রসঙ্গে লেখা।
- প্রথম স্তবকটিই শেষ স্তবকে পুনরাবৃত্ত হয়েছে।

❖ উল্লেখযোগ্য পংক্তি ঃ

- 'আজ সেই ঘরে এলায়ে পড়েছে ছবি'
- 'উদ্যানে ছিলো বরষা পীড়িত ফুল'
- 'কাঁদে না মোহনবাঁশিতে বটের মূল'
- 'লাফ মেরে ধরে মোরগের লাল ঝুঁটি'
- 'সে কি জানিত না যত বড়ো রাজধানী'
- 'এমন ছিলো ন আষাঢ় শেষের বেলা'

অবনী বাড়ি আছো?

সারা পাড়া যখন ঘুমে মগ্ন তখন কবি অবনীর খোঁজ করছেন। এখানে বারোমাস বৃষ্টি পড়ে আর দুয়ার চেপে ধরে পরাঙমুখ সবুজ নালি ঘাস। কবির ব্যথার মাঝেই ঘুমিয়ে পড়েন ; সহসা রাতের কড়ানাড়া শোনা যায়।

- কবিতাটি 'ধর্মে আছো জিরাফেও আছো' কব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।
- কবিতাটি স্তবক সংখ্যা ৩টি ও পংক্তি সংখ্যা ১২টি।
- কবিতাটি কবি হিজলীতে বসে লিখছেন।
- এই কবিতাটি ওয়াল্টার ভিলা থেয়েরের The listener-এর প্রভাব রয়েছে।
- কবিতায় তিনটি জিজ্ঞাসা চিহ্ন (?) ও একটি দাঁড়িচিহ্ন রয়েছে।

❖ উল্লেখযোগ্য পংক্তি ঃ

- 'দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া'
- 'বৃষ্টি পড়ে এখানে বারোমাস
  এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে'
- 'আধেকলীন হৃদয় দূরগামী
  ব্যাথার মাঝে ঘুমিয়ে পড়ি আমি'
- 'অবনী বাড়ি আছো.'

চাবি

কবিতার প্রিয়তমাকে জিজ্ঞাসা করছেন সে কিভাবে তোরং খোলে কারন চাবি কবির কাছে। সেই চাবি ফেরত চায় কিনা তা জানতে কবি চিঠি লিখেছেন। অবান্তর স্মৃতির মধ্যে কবি প্রিয়তমার ঝলোমলো মুখ দেখেন।

- 'চাবি' কবিতাটি 'ধর্মে আছো জিরাফেও আছো' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।
- কবিতাটি চারটি স্তবকে মোট ১২ পংক্তি আছে।
- কবিতায় দ্বিতীয় স্তবকের শেষে একটি মাত্র দাঁড়িচিহ্ন (।) ও মোট ৫টি জিজ্ঞাসা চিহ্ন আছে।
- কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল-'কৃত্তিবাস' পত্রিকা ১৩৬৯ এর চৈত্র সংখ্যায়।
- কবিতায় 'চিঠির' কথা উল্লেখ আছে এছাড়াও নতুন দেশের কথা আছে।

❖ উল্লেখযোগ্য পংক্তি ঃ

- 'তোমার প্রিয় হারিয়ে যাওয়া চাবি'
- 'থুৎনি পরে তিল তো তোমার আছে'
- 'চিঠি তোমায় হঠাৎ লিখতে হলো।'
- 'চাবি তোমার পরম যত্নে কাছে'
- 'অবান্তর স্মৃতির ভিতর আছে'

হেমন্তের অরন্যে আমি পোস্টম্যান

কবি বলেছেন তিনি হেমন্তে আমি পোস্টম্যান। আমরা ক্রমশই দূরে সরে সরে যাচ্ছি একে অপরের থেকে। আমরা অনেকদিন একে অপরকে ভালোবেসে আদর করিনি, দাঁড়ায়নি মানুষ মানুষের পাশে। মানুষের মাঝে দূরত্ব বাড়ে কিন্তু গাছেদের সাথে দূরত্ব বাড়ে না।

- 'হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান' কবিতাটি 'হেমন্তের অরন্যে আমি পোস্টম্যান' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।
- 'হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান' কাব্যগ্রন্থ সংস্করণ মার্চ ১৯৬৯।
- কবিতাটি 'সুধেন্দু মল্লিক বন্ধুবরেষু' কে উৎসর্গ করেছেন।
- কবিতাটির মোট পুংক্তি সংখ্যা ৩৬টি

- **উল্লেখযোগ্য পংক্তি ঃ**
  - ‘হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান ঘুরতে দেখেছি অনেক’
  - ‘আমাদের পোস্টম্যান গুলির মতো নয় ওরা’
  - ‘অনেকদিন আমরা পরস্পরে আলিঙ্গন করিনি’
  - ‘হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান ঘুরতে দেখেছি অনেক’
  - ‘একটি চিঠি হতে অন্য চিঠির দূরত্ব বেড়েছে কেবল’
  - ‘একটি গাছ হতে অন্য গাছের দূরত্ব বাড়তে দেখিনি আমি।’

যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো?

কবি উপলব্ধি করেছেন; ঘরে দাঁড়ানোই ভালো। কারণ এতকাল মেখেছেন দুহাতে কিন্তু কখনো তোমার করে তোমাকে ভাবিনি। কবি চাইলে যে কোনোদিকেই চলে যেতে পারেন কিন্তু তিনি যাবেন না।

- কবিতাটি ‘যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো?’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। কাব্যটির প্রথম সংস্করণ মার্চ ১৯৮২খ্রিস্টাব্দে।
- কবিতাটি ম্যাডাম আর সুবোধকে (কবিবন্ধু সুবোধ দাস ও শিপ্রা দাসকে) উৎসর্গ করেছেন।
- কবিতাটি প্রথম ‘দেশ’ পত্রিকায় ১/৯/১৯৭৯ সালে কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয়।
- ‘যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো?’ কবিতার পরিপূরক কবিতা হল -‘এপিটাফ।’
- কবিতাটির মোট ৬টি স্তবক ১৬টি চরণে বিভক্ত।

❖ **উল্লেখযোগ্য পংক্তি ঃ**

- ভাবছি; ঘুরে দাঁড়ানোই ভালো।
- ‘এত কালো মেখেছি দু হাতে’
- ‘এখন গঙ্গার তীরে ঘুমন্ত দাঁড়ালে
  চিতাকাঠ তাকে; আয় আয়’
- ‘যে কোনো দিকেই আমি চলে যেতে পারি
  কিন্তু কেন যাবো?’
- ‘তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো
  একাকী যাবো না অসময়ে।’

teachinns Text with Technology

Sub Unit - 13
কবিতা সিংহ (১৯৩১ - ১৯৯৮)

কবিতা সিংহ এর ছদ্মনাম সুলতানা চৌধুরী। ১৯৪৬ খ্রীঃ প্রথম কবিতায় প্রকাশ, নারীমুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। কবিতা সিংহ 'শতভিষা'; 'কৃত্তিবাস'; 'দেশ' পত্রিকার বিশিষ্ট লেখিকা। তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিশ শতকের পাঁচের দশকের কবিতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বন্ধুরা এজন্য তাঁকে 'ভার্জিনিয়া উলফ' বলে ডাকতেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস পাপপুণ্য (১৯৬৪) ও প্রথম কাব্যগ্রন্থ (১৯৬৫) খ্রীঃ সহজসুন্দরী প্রকাশিত হয়।

তথ্য

- কবিতা সিংহের কবিতায় প্রতিবাদী মেয়ের কণ্ঠস্বর খুঁজে খুঁজে পাওয়া গেছে। মেয়েদের নিশ্চল, নিশ্চুপ প্রতিমার, মতো স্থির মেনে নেওয়ার প্রবনতা তিনি মেনেনিতে পারেননি।
- কবিতা সিংহ নারী স্বাধীনতার পক্ষে আন্দোলন করেছেন।
- সাহিত্য বিশেষ অবদানের জন্য তিনি যে পুরষ্কার গুলি পেয়েছেন সেগুলি হল - লীলা পুরষ্কার, মতিলাল পুরষ্কার, ভুয়ালকা পুরষ্কার।
- 'হরিণাবৈরী' কবিতার উৎস ভুসুকপাদের বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি - 'আপনা মাংসেঁ হরিণা বৈরী'। (৬ সংখ্যকপদ)।
- কবিতা সিংহের শেষ কাব্য হল -
  'বিমল হাওয়ার হাত ধরে'।

উল্লেখযোগ্য মন্তব্য :

- "তিনিই সেই প্রথমা যিনি পুরুষসর্বস্ব জগৎকে প্রত্যাখ্যান করে গড়ে তুললেন এক ঈপ্সিত জগতের বিকল্প ছবি, সমাজ নির্দিষ্ট কোনো আদর্শায়িত ভূমিকার বাইরে দাঁড়িয়ে তৈরি করেন নারীর এক নিজস্ব সমৃদ্ধ কারা ভুবন।"
  [মঞ্জুশ্রী সেন; 'কবিতা সিংহের কবিতা' প্রবন্ধ]
- কবিতা সিংহ যে সকল দিক থেকে একমেবাদ্বিতীয়ম, বাংলা সাহিত্যে তাঁর কোনো তুলনা নেই। আজকের নারীবাদীদের চেয়ে অনেক ক্লেশ বেশি পথ হাঁটতে হয়েছিল তাঁকে।
  [নবনীতা দেবসেন, একান্তর]

কবিতার নাম	কাব্যগ্রন্থের নাম	প্রকাশকাল	প্রথম লাইন	শেষ লাইন
রাজেশ্বরী নাগমণিকে নিবেদন	হরিণাবৈরী	১৯৮৫	আজীবনলজ্জা ঢেকে দেবে বলে তার সেই একান্ত পুরুষ	যার নাম হন্তারক তার নাম হিংস্র পুরুষ।।
প্রেমতুমি	হরিণাবৈরী	১৯৮৫	প্রেম, তুমি তাহাকে চেননি,	তোমার অগ্নির জন্য বসে থাকা তাহার নিয়তি।।
হরিনাবৈরী	হরিণাবৈরী	১৯৮৫	অঘোর গৈরী পথ বৈরাগিণী	একেলা নিলয় খোঁজে কোথা রে হরি?
আন্তিগোনে	হরিণাবৈরী	১৯৮৫	একটি সতেরো বছরের মেয়ের পায়ের তলায়	জন্ম দিতে জানে তোকে, তোকে আন্তিগোনে!

গর্জনসত্তর	হরিণাবৈরী	১৯৮৫	পিতল ধ্বনিতে করলো তাদের ছুট -	সেই সব মুখ, সরল কোমল রেখাহীন গর্জন সত্তর!

বাগেশ্বরী নাগমণিকে নিবেদন

আজীবন ধরে সমাজে পুরুষদের দ্বারা যে নারীলিপ্স নিসংশ ঘটনা গুলি ঘটে চলেছে কবিতা সিংহের বাগেশ্বরী 'নাগমণিকে নিবেদন' এরই অবতারনা। কবিতায় 'দয়মন্তী' নামক এক নারীর উল্লেখ রয়েছে যার খুন হয়েছে রক্ষকের হাতে, বিশ্বাসের হাতে তার ভাগ্য ছিল রাজেন্দ্রাণী। সেই নারী রাজেশ্বরী নাগমণিকের বিষ ইনজেকসনে নিহত করে উলঙ্গ অবস্থায় পথে ফেলে দেওয়া হয় এই নারীর সোচনীয় অবস্থা 'বাগেশ্বরী নাগমনিকে নিবেদন' কবিতায় তুলে ধরেছেন।

- 'বাগেশ্বরী নাগমণিকে নিবেদন' কবিতাটি 'হরিণাবৈরি' (১৯৮৫) কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয়।
- কবিতাটিতে দময়ন্তীর প্রসঙ্গ রয়েছে।
- কবিতায় ডোমের উল্লেখ আছে।
- কবিতায় মোট লাইনের সংখ্যা - ৩২।
- শৃগাল; কীট, অরণ্য ও পুরুষের উল্লেখ আছে।
- কবিতায় বিস্ময়সূচক চিহ্ন (!) ৬টি।

উল্লেখযোগ্য পংক্তি :

- রক্ষকের হাতে খুন বিশ্বাসের হাতে খুন
  ভাগ্যে তোর ছিল রাজেন্দ্রানী
  আহা তোর সব লজ্জা ঢেকে দিল দয়াময় ডোম।
- পুরুষ সর্বস্ব চায় নিজের কবলে, নিচে, পক্ষপটে শাখার তলায়।
- . . . . . যার নাম হন্তারক, যার নাম হিংস্র পুরুষ।।

প্রেমতুমি

কবিতা সিংহের 'প্রেম তুমি' কবিতায় এক প্রেমিকের আর্ত, যন্ত্রনা প্রকাশ পেয়েছে। প্রেমিকের ছেড়ে চলে যাওয়ার যন্ত্রনা যা প্রেমিকা নারী কখনও বিশ্বাস করত না তাই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেবল প্রেমিকে বলে খান্ত হননি তিনি নিয়তিকে দোষারপ করেছেন নিয়তির জন্য আক্ষেপ করেছেন আর্ত স্বরে। তাকে কলঙ্কিত করা, তাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার অর্তনাদ প্রকাশ পেয়েছে কবিতায়।

- 'প্রেম তুমি' কবিতাটি 'হরিণাবৈরী' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।
- কবিতাটির মোট লাইন সংখ্যা - ১৪।
- কবিতায় নিয়তির কথা উল্লেখ রয়েছে।

উল্লেখযোগ্য পুংক্তি :

- তুমি শুধু দন্তে-ওষ্ঠ চলে গেলে মূঢ় অবিশ্বাসী।
- ও কি সত্য ? প কি ধ্রুব ? কেন তুমি অঙ্গুলিহেলনে ছুঁয়ে দেখলে না ?
- তবু সে অদ্ভুত জানে তুমি তার মুখে অগ্নি দেবে।
- তবু সে নিশ্চত জানে শেষ অগ্নি বড় সত্যবাদী।
- তোমার অগ্নির জন্য ব'সে থাকা তাহার নিয়তি।।

হরিণবৈরী

বৈরাগিনী অঘোর গৈরী পথে সেই পথ যেন আগুনের মতো যেখানে পোড়ে চুল, জ্বলে ত্বক সে জানে না ঘোরে ক্রোধে। কোথায় হরিন চিন্তামন্তি ? সে তো আপনার মাংসে হরিণবৈরাগী, হরিন শিকারের লক্‌লক শিখা অপরদিকে বৈরী আপনা মাসে হরিন্দ অচিন্ হরিন জানে না কোথায় তার নিলয় একলা কোথায় পাবে তার ঘর।

- 'হরিণবৈরী' কবিতাটি হরিণবৈরী (১৯৮৫) কাব্যের অন্তর্গত।
- কবিতাটির পংক্তি সংখ্যা - ১৫।
- কবিতায় 'পোড়াচুল', 'কিডামনি', চোখ, নাক, প্রভৃতির উল্লেখ রয়েছে

উল্লেখযোগ্য পুংক্তি :

- অঘোর গৈরী পথ বৈরাগিণী
- কোথা রে হরিন তুই চিন্তামণি?
- বৈরী আপনা মাসে তোর হরিণী!
- চোখ, নাক, স্তন, ত্বক, মাংসের খান -
- একেলা নিলয় খোঁজে কোথা রে হরিন ?

আন্তিগোনে

কবিতার উল্লেখিত একটি ১৭ বছরের মেয়ে পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়তে পারে না। পুরুষদের ক্রেয়ন এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। যে মেয়েরা সব একসাথে চায় সতীত্ব ও পরকীয়া, সতীচ্ছদ ও রমণ তাদের সর্বগ্রাসী লোভী বলেছেন। আন্তিগোনে ১৭ বছরেই অনুভব করেছিল প্রসবের দুষ্প্রাপ্য আস্বাদ আর জেনেছিল কিছু পেতে গেলে কিছু দিতে হয়। পৃথিবীর সমস্ত পুরুষ করে মাতৃগমন যেটা স্বিকার করেছিল ইডিপাস।

- 'আন্তিগোনে' কবিতাটি 'হরিণবৈরী' (১৯৮৫) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।
- কবিতায় মোট পুংক্তি সংখ্যা - ৪৮টি ও স্তবক সংখ্যা - ১০টি।
- কবিতাটি কেয়া চক্রবর্তীকে উপলক্ষ করে লিখেছেন।
- আন্তিগোনের পিতা - ইডিপাস ও মাতা হলেন যোকাস্তা।
- আন্তিগোনের পোশাকের নাম কলাপাতার রঙ।
- 'থেবাই' এর অনাগত নৃপতি হলেন ইডিপাস। যিনি থেবাই এর রাজা লাইয়ুসকে হত্যা করে রানী যোকাস্তকে বিবাহ করেন।
- 'সফোক্লেস' 'আন্তিগোনে' নাটকটি রচনা করেন ৪৪১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে।

উল্লেখযোগ্য পংক্তি :

- একটি সতেরো বছরের মেয়ের পায়ের তলায়
  লুটিয়ে পড়তে পারে না একবার একবারো
  তাবৎ সংসার ?
- তোমার ওই কলাপাতার রঙ্ পোশাকের পুণ্য প্রান্তদেশ!
- আমি ওই সর্বগ্রাসী লোভী মেয়েদের
  যাদের সমস্ত চাই, সব চাই, সতীত্ব এবং পরকীয়া
  একসঙ্গে সতীচ্ছদ, এবং রমন এমন কি বাৎসায়ন ও
  যাদের বিধান দেন
  দিনে সতী রজনীতে বেশ্যা বনে যেতে (ইতিগজঃ স্বামীর সকাশে)
- জন্মদিনের বড় নিটোল চাঁদের মতো কেক্
  সে কেবল খন্ড খন্ড করে।
- প্রসবের দুষ্পাপ্য আস্বাদ

কারন তুমি যে ওই সতেরোর ভীষন সকালে
জেনেছিলে সত্যিকার কিছু পেলে কিছু - কিছু তো
ছাড়তেই হয়
মাংস ও শরীর।

- আন্তিগোনে, পৃথিবীর সমস্ত পুরুষ করে মাতৃ গমন স্বীকার সাহস রাখে শুধু ইডিপাস

গর্জন সত্তর

পিস্তলের ধ্বনি, অশ্বক্ষুরের ধ্বনি, চারিদিক থর থর করে কেঁপে ওঠার শব্দে ছুটে আসছে গর্জন সত্তর। টগবগ করছে রক্ত, নাক থেকে আগুন ফুঁসছে মাটি কাঁপছে থরথর করে, সেই সঙ্গে অশ্বারোহীদের উল্লাস। গর্জন সত্তর সমাজের গতানুগতিকতা, মিথ্যা ইতিহাস ভেঙে ফেলতে এগিয়ে আসছে। অন্ধপাহাড়, বধির নদী, মন্দিরের সাজানো মুখোশ, পদ্মভোজীর ডেরা, বাস্তুঘুঘুর ঘুম প্রভৃতির উল্লেখ রয়েছে।

- গর্জন সত্তর কবিতাটি 'হরিণাবৈরী' (১৯৮৫) কাব্য গ্রন্থের অন্তর্গত।
- কবিতাটিতে মোট পুংক্তি সংখ্যা - ৫২
- কবিতায় 'গর্জন সত্তর' শব্দটি ৬ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য পংক্তি :

- পিস্তল ধ্বনিত করলো তাদের ছুট -
- টগবগ করছে রক্ত / কেশর কাঁপছে রাগে
- তারা নকল ইতিহাসকে ভাঙতে আসছে।
- র‍্যাবো ভেরলেন শার্ল বোদলেয়ার কাঁচিকাটা করে
- নীল-ছবি পোষ্ট কার্ডে / যারা দেখবে না
- যে-কোনো মুহূর্তে আমি দেখতে পাবো
  সেইসব মুখ সরল কোমল রেখাহীন গর্জন সত্তর!

teachinns Text With Technology